মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব

জীবন ও জীবনাদর্শ

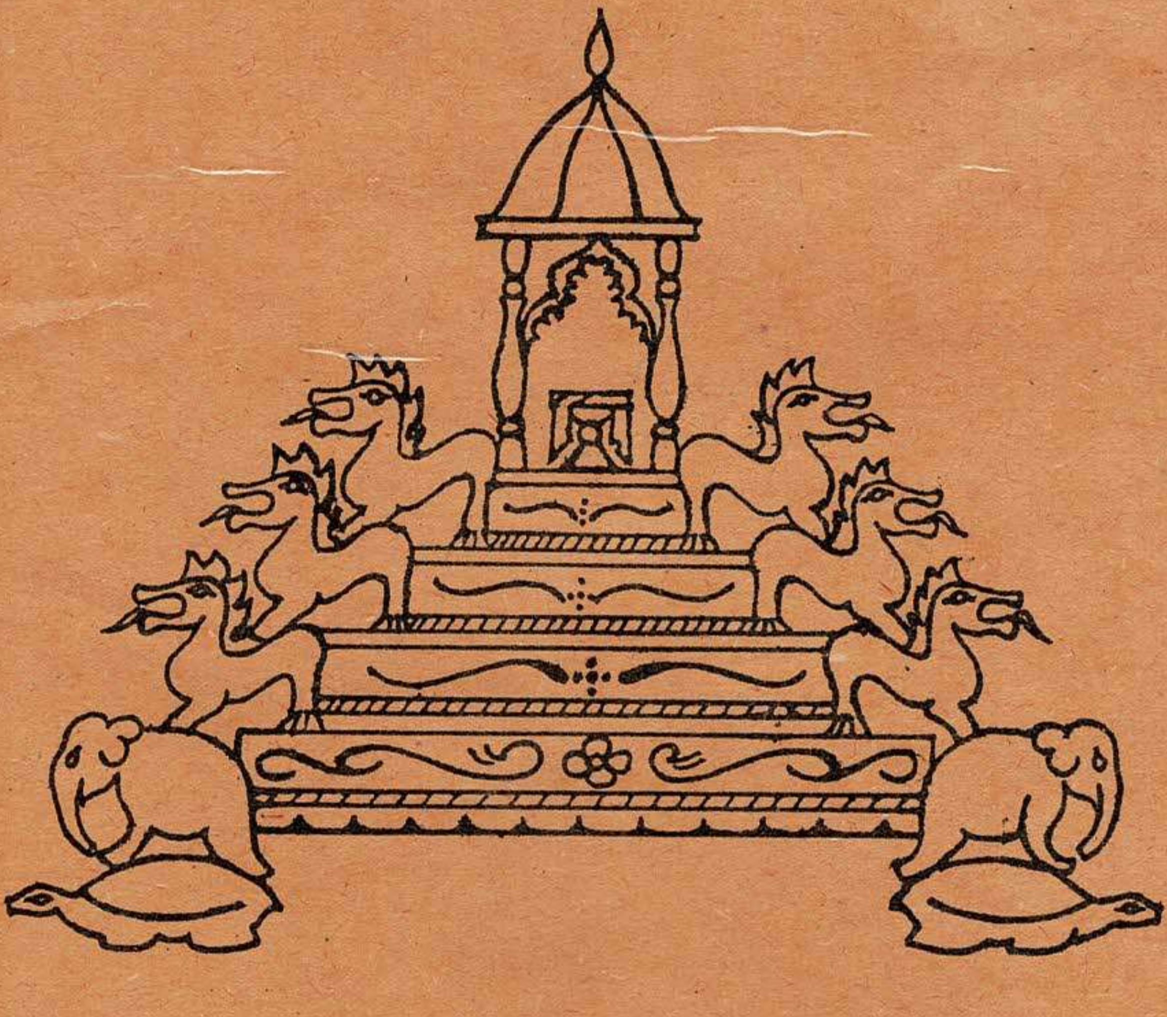

ধীরেণ দাস

মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব

জীবন ও জীবনাদর্শ

ধীরেন দাস

MAHAPURUSH SRIMANTA SHANKARDEV—
JIBAN O JIBANADARSHA.
Written by Dhiren Das and Published by Supriyo Das.
Rekjoani, Rajarhat. 24-parganas, West Bengal.

প্রকাশক :
শ্রীসুপ্রিয় দাস, রেকজোয়ানী রাজারহাট, ২৪ পরগণা (উঃ)

মুদ্রন :
জাগরণী প্রেস,
৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
শ্রীধরণী বর্মণ, তেজপুর, অসম।

প্রচ্ছদ শিল্পী : নন্দিনী দাস।
লেখকের দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান :
'বুকস' ১৮/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

মূল্য : ৪০·০০

উৎসর্গ

মা ও বাবার

পুণ্যস্মৃতি স্মরণে—

ধীরেন দাস—

"যদি এমন মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র

॥ নিবেদন ॥

"বহুগুণনিধি", অসমীয়া জাতি ও জাতীয়তাবাদের জনক, ভাষা সাহিত্যের স্রষ্টা, সভ্যতা সংস্কৃতির উৎস এবং সর্বোপরি ধর্ম প্রবর্তক শ্রীমন্তশংকরদেবের ন্যায় প্রতিভা ইতিহাসে বিরল। শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবিতকালে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর ভক্ত-শিষ্য চরিতকারদের অসংখ্য রচনায় এই ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষের কৃতি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং আধুনিক অসমীয়া চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদেব নানা রচনায় শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শের নব-মূল্যায়ন প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত।

কিন্তু বহির্বিশ্বে এমনকি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই মহাপুরুষের কর্মময় জীবন ও তাঁর সমকালীন সমাজ-জীবনের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় বহুমুখী অবদানের কথা আজও বহুলাংশে অবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট যেমন শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন অজ্ঞাত, তেমনি বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে স্বনামধন্য সাহিত্যিক, শিল্পী ও অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের কাছেও অজানা; তৎকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার মহন্তের হাত থেকে "শংকরদেব পুরস্কার" গ্রহণ কালে যিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'কে এই শংকরদেব'?

বাংলা ভাষায় মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখবার বাসনা তাই অনেক দিন থেকেই মনে ছিল। কিন্তু সাধ যতটা ছিল সাধ্য ছিল তার অনেক কম। শ্রীমন্তশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সম্ভার, চরিতকারদের অসংখ্য গুরুচরিত এবং প্রাচীন ও আধুনিক কবি, সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের সব রচনা পাঠ করে তত্ব ও তথ্য আহরণ অতি শ্রমসাধ্য কাজ। আমার সাধ তাই অংশত অপূর্ণ ই রয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শ্রীউমেশচন্দ্র দেব বাংলা ভাষায় প্রথম ইতিহাসভিত্তিক শ্রীশংকরদেবের জীবনী রচনা করেন। বইটির নাম "শংকরদেব" বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। তবে সম্প্রতি ডঃ নগেন শইকীয়ার সম্পাদনায় নতুন কলেবরে প্রকাশিত। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে

শ্রীশংকরদেবের ধর্ম, সাহিত্য ও জীবন দর্শনের সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন আছে এছাড়া গুয়াহাটীর মালিগাঁও নিবাসী অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রণজিৎ কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের লেখা "মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদেব" (Lawyers' Book Stall, Panbazar, Guwahati, 1988) ভিন্ন বাংলা ভাষায় লিখিত আর কোন রচনা পাওয়া যায় না। উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে এ-তথ্যই উল্লিখিত যে শ্রীশংকরদেব অসমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক, তিনি ধর্মগুরু। ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে নানা ধর্মাবলম্বী ও মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আচার আচরণে বিশ্বাসী বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানা জাতি উপজাতিকে তিনি এক ধর্মের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন ভাষা সাহিত্য। কিন্তু সমসাময়িক বৃহত্তর রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় এই মহাপুরুষের কৃতি ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন এ গ্রন্থগুলিতে নেই। বর্তমান গ্রন্থ সেই বৃহত্তর পটভূমিকায় শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার ক্ষুদ্র চেষ্টা মাত্র। কোন যোগ্যতর হাতের লেখনিতে একদিন এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্তের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রার্থনা।

রামচরণ ঠাকুর রচিত 'শংকর চরিত', দৈত্যারি ঠাকুর রচিত 'মহাপুরুষ শংকরদেব ও মাধবদেব', রামানন্দ দ্বিজ রচিত 'গুরুচরিত', ডঃ বাণীকান্ত কাকতি সংগৃহীত 'কথা গুরু চরিত' এবং পরবর্তী যুগের 'মহাপুরুষ শংকরদেব ও শ্রীমাধবদেব' লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, Sankardeva—Dr. Banikanta Kakati, অসম বুরঞ্জী—ডঃ সূর্য্যকান্ত ভূঞা, A History of Assam—Sir Edward Gait, কোচবিহারের ইতিহাস—আমানউল্লা আহমদ, Sankardeva and His Times, ও 'শ্রীশ্রীশংকর-দেব'—ডঃ মহেশ্বর নেওগ, The Neovaishnavite Movement and the Satra Institution of Assam—Dr. Satyendra Nath Sarma, 'কীর্তন পুথির রসবিচার' ও 'শংকরদেব ও অসমর ইতিহাস'—ডঃ হীরেণ গোহাঞি ও 'শ্রীমন্তশংকরদেব কৃতি আরু কৃতিত্ব', শ্রীমন্তশংকরদেব ও তেওঁর যুগর—বৈষ্ণবাচার্য্য সকল,—ডঃ শিবনাথ বর্মন ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই রচনার যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য সূত্র। অনবধানতা বশতঃ কোন ভুল ত্রুটির জন্য আমার অক্ষমতা দায়ী।

বাংলা এবং অসমীয়া একই ভাষা মায়ের (মগধি-মৈথিলী) দুটি সন্তান হলেও অসমীয়া ও বাংলা হরফের ধ্বনিগত (Phonetics) কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, বাংলা 'স'-এর উচ্চারণ অসমীয়াতে সাধারণত 'হ' এবং অসমীয়া 'ট' বাংলা

'ত' বা বাংলা 'ট' অসমীয়াতে 'ত'-এর ধ্বনি হয়, যদিও অনেক ব্যাতিক্রমও বিদ্যমান। উপরন্তু বাক্যগঠন প্রণালীতে (Syntax) দুই ভাষায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। এই রচনায় অসমীয়া যাবতীয় পদ্য উদ্ধৃতিতে বাংলা বানান ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া গদ্য উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ লেখকের।

বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক "শীলভদ্র" বইখানা লেখবার জন্য বরাবর উৎসাহ দিয়েছেন। বয়োকণিষ্ঠ বন্ধুবর স্বনামধন্য লেখক ও প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানী ডঃ শিবনাথ বর্মন প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন; এবং পাণ্ডুলিপির প্রথম অধ্যায় পরিমার্জনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা ভিন্ন হয়তো এ বই লেখা হত না। অধ্যাপক ডঃ শ্রী ভাবনী সরকার সম্পূর্ণ পাণ্ডু-লিপিটির যাবতীয় ভাষাগত ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বইটির মুখবন্ধ (প্রীতিবাক্) লিখেছেন বিদগ্ধ সংস্কৃতিবিদ ও সুপ্রসিদ্ধ অসমীয়া কবি অধ্যাপক নবকান্ত বরুয়া। কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে শ্রীমন্তশংকরদেব প্রচারিত সম্প্রীতি—সদ্ভাব রক্ষায় কণামাত্রও সাহায্য করে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

রাজারহাট,
উত্তর ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ।

ধীরেন দাস।

প্রীতিবাক্

শ্রীধীরেন দাসের 'মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব : জীবন ও জীবনাদর্শ' বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আমার মনে যে কয়টি কথা উদয় হয়েছিল তাই লিপিবদ্ধ করছি প্রীতিবাকে। শ্রদ্ধা ও নির্মোহ আকর্ষণ এই বইটির অন্তরস্থ চরিত্র। তার সংগে রয়েছে শংকর কৃতি আর শংকর চরিত্র বাংলা ভাষী পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়ার এক স্বনিষ্ঠ প্রয়াস।

মহৎ বলে স্বীকৃত লোকের জীবন কথা আহরণ করতে হয় তাঁর কৃতি থেকে। তাঁরা যদি কোনো পরম্পরা রেখে গেছেন, সেই পরম্পরার সংবাদ আহরণ করেও মহৎ জনের ব্যক্তিত্ব খানিকটা পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই মহৎ ব্যক্তি যদি কিছু রেখে যায় লেখার মাধ্যমে তাতে তার ব্যক্তিত্ব আর পরিবেশ দুটোই বুঝতে পারা যায়। অসমের বৈষ্ণব গুরু শংকর দেব (শ্রীযুত দাসের ভাষায় 'মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব') ভবিষ্যতের জন্য সেই সুবিধাটুকু দিয়ে গেছেন। কেবলমাত্র প্রবাদ এবং কিম্বদন্তির মধ্যে জীবিত না থেকে তিনি নিজের লেখায় নিজেকে রেখে গেছেন। কয়েকটী বরগীত ছাড়া ওঁর প্রায় সবগুলো লেখাই পাওয়া গেছে। তার উপর অসমের Pluralistic সমাজের উপযোগী করে বৈষ্ণব নবজাগরণে সৃষ্ট ভাগবতী ধর্মের কৃষ্ণ-ভিত্তিক ভক্তিবাদকে প্রয়োগ করে তিনি সমাজ জীবনে একটা পরম্পরা সৃষ্টি করে গেছেন, যেটা একাধারে সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক।

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে সেই পরম্পরা বিভিন্ন খাতে প্রচলিত ছিল। আর এখনও নতুন (বিভিন্ন ?) কর্ম আর চিন্তায় তা অবিরাম গতিতে চলছে। ঐতিহাসিক এক দুর্যোগের পর ইংরাজ শাসক ও মিশনারীরা যখন ভারতের এই অঞ্চলে আসেন তখন 'হংকর দেও' (Hanker deo) বলে একজনের কথা জানতে পেরেছিল। ব্যাপ্টিষ্টরা যখন অসমে গীর্জা নির্মাণ করে তখন ওরা দেশীয় ভাষায় তার নাম দিয়েছিল 'নামঘর'—ভগবানের নাম নেওয়ার স্থান। (পর্তুগীজ থেকে আহৃত গীর্জা শব্দটি পরে মণ্ডলীর দেশীয় লোকেরা পছন্দ করেছিল—সেটা অন্যপ্রসঙ্গ)। নামঘর আর সত্র শংকরদেব প্রবর্তিত ধর্মের একটা বিশিষ্ট অংগ। (সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থাগারের অবশিষ্টের উপর তা নির্মিত হয়েছিল—সেও অন্য প্রসঙ্গ)। অধুনা নামঘর একান্তভাবে ধর্ম-সামাজিক কেন্দ্র আর সত্রের সঙ্গে

জড়িত থাকে বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ধর্ম-কর্ম পদ্ধতি। প্রায় সবগুলো সত্র একরকম এক একটা গোষ্ঠী ভিত্তিক—যাকে সংহতি বা সংঘটি বলা হয়।

কৃতির একটা বিশেষ গুণ : তার মধ্যে আদর্শ নিহিত থাকে। ব্যক্তির জীবন—বৃত্ত পুনর্নির্মাণে অসুবিধা হ'লেও তাঁর আদর্শের সন্ধান কৃতি অনুধাবনে সহজে মেলে। অবশ্য তার সংগে প্রয়োজন হয় তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমির কিছু সংবাদ। শংকরদেবের অব্যবহিত পরেইসত্র, শিষ্য ও পরিবার পরম্পরায় রচিত তাঁর আরো অনেক অনুগামীদের জীবন বিষয়ক রচনা (চরিতপুথি) পাওয়া যায়। আধুনিক কালে তার জীবন আর কৃতি নিয়ে অসমীয়া আর ইংরেজীতে বেশ কিছু নতুন 'আলোক ছড়ানো' হয়েছে, যার আভাস এই বইয়েও পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিবেশী সহোদর বাঙলা ভাষী পাঠকদের কাছে 'শংকরদেব অনেকটা জনরবের মতোই রয়ে গেল। তার কারণ সন্ধান করে লাভ নেই। আমার আনন্দ হয়েছে যে শ্রীধীরেন দাস মহাশয় বাঙালী পাঠকের কাছে শংকরদেবের জীবন সাহিত্য-কৃতি ও জীবনাদর্শের একটা প্রমাণ্য চিত্র অংকনে ব্রতী হয়েছেন। শংকরদেব অসমের একজন বৈষ্ণব ধর্মগুরুই নন, কার্লাইলের সূত্র অবলম্বন করে তাকে বলা যায় : 'Hero as a Man of Culture'. ধর্ম-গুরুর চাইতে তাঁকে সংস্কৃতি-গুরু বললে তাঁর প্রকৃত গুরুত্ব দেখানো সম্ভব ; আর, সংস্কৃতি যে প্রায় সমস্ত অর্থেই সংস্কার-কেন্দ্রিক তাও অনুভব করা যায়। ভাব, বেগ আর স্থিতি-স্থাপকতা—এই তিনটিকে বৈশেষিকে সংস্কারের গুণ বলা হয়েছে ! শংকরদেবে সংস্কৃতি-কর্মে তার পরিচয় পাই।

শ্রীধীরেন দাস মহাশয়ের বইতে এই অনুভব স্পষ্ট। আর, সেইজন্যে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ, অধ্যয়ন আর চিন্তা করেছেন তারও পরিচয় আছে ছত্রে ছত্রে অধ্যায়ে অধ্যায়ে।

আমার মনে হয় বাঙলা ভাষায় শংকরদেবের বিষয় সশ্রদ্ধ অথচ নির্মোহ অবলোকনে রচিত এই বইখানা জিজ্ঞাসুর জন্যে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সংযোজন হবে। সহৃদয় কর্মের অন্য নাম হলো কুশলকর্ম।

'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু'

১৫।৯।৯৭ **নবকান্ত বরুয়া**

গুয়াহাটি

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	প্রথম অধ্যায় :	মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব-জীবন ও জীবনাদর্শ।	১—১৭
২।	দ্বিতীয় অধ্যায় :	শ্রীশংকরদেব—ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ।	১৮—৩৩
৩।	তৃতীয় অধ্যায় :	শ্রীশংকরদেব—ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক।	৩৪—৫৯
৪।	চতুর্থ অধ্যায় :	শ্রীশংকরদেব-সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম বনাম সমাজ সংস্কার।	৬০—৮০
৫।	পঞ্চম অধ্যায় :	উপসংহার।	৮১—৮৭
৬।	পরিশিষ্ট (ক) :	উৎস সূত্র।	৮৮—৯২
৭।	পরিশিষ্ট (খ) :	শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও যুগপঞ্জী।	৯৩—৯৮
৮।	পরিশিষ্ট (গ) :	শ্রীমন্তশংকর রচনাবলী, জীবনী ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ।	৯৯—১০২

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

জীবন ও জীবনাদর্শ

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে মহাপুরুষ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার ছোট বড় গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-পর্বতে, সমতল ও উপত্যকায় বসবাসকারী নানা জাতি উপজাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠিকে ধর্ম, সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তিনি শ্রীশ্রী শংকরদেব। পুস্তক প্রণয়ণ, প্রকাশণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ভৌগোলিক দূরত্বের সীমাবদ্ধতা হেতু এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন-কথা বহির্বিশ্বে এমনকি ভারতের বিভিন্নপ্রান্তেও বহুকাল প্রায় অজ্ঞাতই থেকে যায়। উল্লেখযোগ্য যে ১৯০১ খৃঃ অব্দের মে মাসে অসম সফর শেষে বেলুড় মঠে ফিরে আসার পর, শিষ্যের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক হঙ্করদেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তার সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। ঐ হঙ্করদেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কিনা বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় বিশেষ।"[১]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের নব যুগের আরম্ভ হয়। একাধারে নিত্যনতুন সাহিত্য সৃষ্টি এবং অন্যদিকে ভাষা-বিজ্ঞান চর্চার ফলস্বরূপ অসমীয়া ভাষা—সাহিত্যের জনক শ্রীশ্রীশংকরদেবের বহুমুখী কর্মময় জীবন ও ভাবাদর্শের প্রকাশ ও প্রচারের শুভারম্ভ। অসমীয়া ও ইংরেজী ভাষায় অসমের ইতিহাস এবং মহাপুরুষের স্বরচিত বিভিন্ন কাব্য, অনুবাদ ও নাটকের উপর নানা গবেষণা মূলক গ্রন্থ, চরিতকারদের রচিত শ্রীগুরুর জীবনী প্রকাশ এই নব যুগের সূচনা করে। পরবর্তীকালে অসমীয়া কবি সাহিত্যিকদের নানা রচনা ও বর্তমানে বিদগ্ধ গুণীজনদের তাঁর রচনাবলীর নব নব মুল্যায়নের ফলে শংকরদেবের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও ভাবাদর্শ আজ সর্বভারতে তথা বহির্বিশ্বের সুধীমহলে অতি পরিচিত।

ইং ১৪৪৯ খৃঃ অব্দে (১৩৭১ শক) ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কার্ত্তিক

সক্রান্তির মধ্যরাত্রি অমাবস্যা থিতিতে (মতান্তরে আশ্বিনের শুক্লাদশমী) মধ্য অসমের (বর্তমান নগাঁও) আলিপুখুরী গ্রামে মহাপুরুষ শংকরদেব জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইং ১৫৬ খৃঃ অব্দে (১৪৯০ শক) ভাদ্র মাসের দিবা ভাগে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে প্রায় ১২০ বৎসর বয়সে বর্তমান কোচবিহার জেলার মধুপুরে ইহলীলা সম্বরণ করেন। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষদের ন্যায় শ্রীশংকরদেবের জন্ম ও মহা-প্রয়াণের সন, মাস, দিন, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতোবিরোধ দেখা যায়। সমসাময়িক পণ্ডিত ও শিষ্য ভক্তদের মধ্যে নিজ গুরু জীবনচরিত প্রণেতারা বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দিন, তারিখ, তিথি-নক্ষত্র উল্লেখ করেছেন। এমনকি বর্তমান যুগের কবি ও লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, অসমীয়া ভাষার ইতিহাস ও উন্মেষ গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ বাণীকান্ত কাকতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতিবিদ ডঃ মহেশ্বর নেওগের মত বিদগ্ধ মণীষীও এই বিষয়ে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। ডঃ মহেশ্বর নেওগ তাঁর বিখ্যাত "শ্রীশ্রীশংকর দেব" গ্রন্থে বলেছেন, 'অনুমান হয়, জন্মের তারিখ, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয়ে মহাপুরুষ শংকরদেবের জীবিত অবস্থায়ও মতভেদ ছিল।'[২]

সন-তারিখের হিসাবমতে এটাই প্রতীয়মান হয় শ্রীশংকরদেব ভারত ইতিহাসের সৈয়দ বংশের শেষ শাহ, শাহ-অল-উদ্-দিন আলম শাহের (ইং ১৪৪৫ —১৪৫১) সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং লোদি বংশের এবং পরে সম্রাট, আকবরের রাজত্বকাল (ইং ১৫৫৬—১৬০৫) পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন ; যদিও বর্তমান অসম তথা সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত উপরিউক্ত কোন সম্রাটের রাজ্যেরই অধীন ছিল না। একাধিকবার আক্রমণ করেও তারা বার বাব প্রতিহত বা পরাজিত হয়েই ফিরে আসেন। তবে একথার অর্থ এ নয় যে, ইসলামের কোন প্রভাবই উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভাব-সংস্কৃতির উপর পরেনি। সে প্রসঙ্গ পরে।

এই সাথে অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, "অসম" বলতে বর্তমানে যে ভারতীয় রাজ্যটি বুঝায়, সে সময় তা এরকম ছিল না। নাগাল্যাণ্ড বা নাগা-পাহাড় ও মণিপুর ভিন্ন সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত তখন ছিল তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গ ও অসমের কিছু অংশ নিয়ে বেহার রাজ্য, তার পূর্ব দিকে কামরূপ-রাজ্য (প্রাচীন নাম প্রাগ-জ্যোতিষপুর) এবং তারও পূর্ব-উত্তর দিকে আহোম রাজ্য। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে আর্য্যদের আগমনের পরে যেমন—শক, হুণ, পাঠান, মোঘল রা এসে

পরবর্তীকালে ভারতীয় হয়েছিল, তেমনি আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পথ দিয়ে আবহমান কাল থেকে চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ থেকে নানা সময়ে নানা জাতি-উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে (১০০০ খৃঃ পূঃ)[৩] ভারতীয় হয়েছে। ভাষা-বিজ্ঞানের ভাষায় এক কথায় এরা মঙ্গোলীয় (সংস্কৃত-কীরাত) নামেই পরিচিত। সাময়িকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের এই দুই সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরলেও যোগসূত্র কোনদিনই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সেই হিসেবে কামরূপ নিবাসী শ্রীশংকরদেবই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাবাদর্শের যোগাযোগের পথিকৃত।

শ্রীশংকরদেবের বাল্যনাম গঙ্গাধর। পিতার নাম কুসম্বর ভূঞা। মাতা শ্রীঅনিরুদ্ধ ভূঞার রূপবতী কন্যা সত্য সন্ধ্যা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় পিতামহী খেরসূতী (সূর্যবর ভূঞার পত্নী) দেবী গঙ্গাধরকে লালন পালন করেন। শংকরদেবের পূর্বপুরুষদের বংশাবলী রচয়িতাদের লেখায়ও কিছু কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত ইতিহাস প্রায় সর্বজন স্বীকৃত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুসেন শাহের (ইং ১৪৯৭—১৫২১) গৌড় আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের বার ভূঞাদের অনেকে গৌড়েশ্বর উপাধি নিয়ে উত্তরবঙ্গে রাজত্ব কয়েন। উল্লেখযোগ্য যে, গৌড় দেশের সঠিক বিস্তৃতি জানা খুবই দুঃসাধ্য। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনিতে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] বঙ্গ দেশীয় গৌড় দেশ ছিল বর্তমান বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ সহ) একটি রাজ্য মাত্র, রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। বর্তমান বঙ্গদেশ বলতে যা বুঝায় সম্ভবত সে সময় তা ছিল না। সে যাই হোক, উত্তর বঙ্গের গৌড়েশ্বর ধর্মনারায়ণ ও কামরূপ অধিপতি দুর্লভ নারায়ণের একবার তুমুল যুদ্ধ হয়। দুর্লভ নারায়ণ গৌড়েশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে মহানন্দার তীরে শিবির স্থাপন করেন। সাতদিন যুদ্ধের অন্তে, দু-পক্ষের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পর, উভয়েই যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রস্তাব করায় শান্তি স্থাপন হয়। মিত্রতা বন্ধনহেতু দুর্লভ নারায়ণ ধর্ম নারায়ণের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। নিজ রাজ্যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি শ্রেণীর অভাব হেতু দুর্লভ নারায়ণ জামাতা গৌড়েশ্বর ধর্ম নারায়ণকে কামরূপে কয়েকজন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্বশুর মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ধর্মনারায়ণ সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাতঘর কায়স্থ কামরূপ রাজ্যে প্রেরণ করেন। এই সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাতঘর কায়স্থের মধ্যে বিশিষ্ট বার জন পরবর্তীকালে রাজা

দুর্লভ নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় "বারভূঞা" নামে কামরূপের বিভিন্নস্থানে প্রতিপত্তিশালী সামন্ত নৃপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'ভূঞা' শব্দটি সংস্কৃত 'ভূমি' শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং ভৌমিক শব্দের সমার্থক। পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলার বার ভূঞাদের (ভুইয়া) সবিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার ন্যায় রাজার নামে তারাই ছিলেন দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। অসমে এই সময় বর্তমান নগাঁও অঞ্চল এবং ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরের কিছু অঞ্চল ছিল বার ভূঞাদের শাসনাধীন। আলিপুথুরী ছিল ভুঞা সামন্তদের প্রধান শাসনকেন্দ্র। যে কয়জন কায়স্থ কামরূপ এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যান ছিলেন চণ্ডিবর ভূঞা। স্বভাবতই তিনি ছিলেন প্রধান বা "শিরোমণি ভূঞা", শংকরদেব এই চণ্ডিবরেরই স্বনামধন্য বংশধর যিনি পরবর্তীকালে সর্বপ্রথম কামরূপ তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম বা "একশরণ নাম ধর্ম" প্রচার করে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভক্তি ধর্মে দীক্ষিত করে একসূত্রে গ্রথিত করেন।

চরিতকারদের মতে চণ্ডিবর পুত্র রাজধর। রাজধর পুত্র সূর্য্যবর। সূর্য্যবর পুত্র কুসম্বর এবং কুসম্বর পুত্র শংঝরবর বা শংকরদেব। কথিত আছে মহাদেবের বরে জন্ম হওয়ায় গঙ্গাধরের (বাল্যনাম) নাম রাখা হয় শংকর। শংকরদেবের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় পিতামহীর অশেষ স্নেহের ছত্রছায়া তলে। সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে নানা প্রকার খেলাধূলা ও বনে প্রান্তরে ঘোরাঘুরি করেই তাঁর দিন অতিবাহিত হ'ত। প্রকৃতির শান্ত সুন্দর পরিবেশে বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁর মন এই রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অবশ্য শংকর দুঃসাহসিক হয়ে উঠেন। কথিত আছে—ভালুক ধরে তার পিঠে চড়ে বেড়ান ছিল তাঁর একটা মজার খেলা। সঙ্গীদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, নদীতে লাফিয়ে পরে সাঁতার কাটা ইত্যাদিও ছিল তাঁর নিত্য কর্ম। একদিন ভাদ্রমাসে ভরপুর ব্রহ্মপুত্র নদ সাঁতরিয়ে পারাপার করে তিনি উপস্থিত প্রতিবেশীদের অবাক করে দেন। আর একদিন ভিনদেশী এক মল্লযুদ্ধকারীকে পরাস্ত করে তাঁর প্রচণ্ড দৈহিক বলের পরিচয় দেওয়ার কথাও চরিতকারদের লেখনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন শংকরের বয়স মাত্র তের বৎসর।[৩]

এইসব দেখেশুনে একদিন পিতামহী খেরসূতীদেবী খাওয়ার সময় তিরস্কার করে দিন-রাত বনে বাদারে ঘুরে ঘুরে বাহাদুরি না দেখিয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন। পূর্বপুরুষদের পাণ্ডিত্যের কথাও বারে বারে স্মরণ করিয়ে

দেওয়ায় শংকর তাঁকে কোনও গুরু গৃহের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সেও শাস্ত্র অধ্যয়ণে আগ্রহী, এখবর শুনে খুশি হয়ে পিতামহ জয়ন্ত, মাধব এবং হলায়ুধ ভূঞা একসাথে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর পাঠশালায় রেখে আসেন। এই গুরু গৃহে অধ্যয়ন আরম্ভই শ্রীশংকরের পরবর্তী জীবনের দিকনির্ণয়ের সূচনা। তখন শংকরের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। পাঠশালায় শংকরের সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন রামরায়, শ্রীকণ্ঠভূষণ, বিদ্যাপাঠক, রাম সরস্বতী ইত্যাদি এবং আরো কয়েকজন যাঁরা পরবর্তীকালে সকলেই শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলীসহ শ্রীমন্ত শংকরদেবের 'এক শরণ ধর্ম' গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় শ্রীশংকর অসাধারণ মেধার পরিচয় দে'ন। চরিতকারদের মতে ক ফলা আয়ত্ব করার সাথে সাথেই "করতল-কমল-কমল-দল-নয়ন" ইত্যাদি গান রচনা করে সতীর্থ ও গুরু মহাশয়কে অবাক করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ অধ্যবসয়ের অধিকারী হওয়ায় অতি অল্পসময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ, পুরাণ, রামায়ণ ও নানা শাস্ত্র অনায়াসে আয়ত্ত করে ক্রমে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রূপে পরিচিত লাভ করেন। এই সময় তিনি যোগ্যভ্যাস শিখে অনতিকাল মধ্যে যোগীপুরুষ হিসেবেও সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

টোলের শিক্ষা সমাপ্ত করে আঠার বৎসর (ভিন্ন মতে ২১ বৎসর) বয়সে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রচনা করেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে "হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান"। ঘরে ফিরে আসার পর ক্রমে সংসারের অন্যান্য দায়িত্বও শ্রীশংকরকে বহন করতে হয়। খুড়তোতো পিতৃব্য জয়ন্ত দলে কিছুদিন পরে "শিরোমণি ভূঞার" বিষয়ভার অর্পণ করায় শ্রীশংকরের মাথায় গুরুদায়িত্ব এসে পরে। অতি অল্পবয়সে ভূঞা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ ও সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার কৃতিত্বের জন্য তিনি "ডেকা (তরুণ) গিরী" নামে পরিচিত হন। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীশংকরদেব বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন অবস্থায় দশটি নামে পরিচিত ছিলেন, যথা ডেকাগিরী, শংকর, গদাধর, মহাপুরুষ, আচার্য্য, সন্ত, মহন্ত, গোমস্তা এবং জগন্নাথ।[৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীশংকর গুরুগৃহে ছাত্রাবস্থায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সাথে সাথে যোগ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন এবং যোগাভ্যাস করে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। কথিত আছে "কুম্ভক" করে সেই অবস্থায় তিনি দুই—তিন দিন পর্য্যন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু ভক্তি ধর্মের মূলতত্ত্ব জ্ঞান

হওয়ায় আধ্যাত্মিক সাধনায়—যোগবিদ্যার নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে তা ত্যাগ করে একান্তমনে ভাগবত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে শ্রীশংকরের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে প্রতিদিন প্রচুর লোকসমাগম দেখে খুড়তোতো পিতামহ জয়ন্ত ও মাধব ভূঞা সহ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বৈকুণ্ঠের চিত্রাংকণ করে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য অনুরোধ করায় পটাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত শ্রীশংকর বিপুল উৎসাহে বৈকুণ্ঠের পট অংকণ করে প্রশংসা লাভ করেন, দূর-দূরান্ত থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা টেম্বুয়ানী এসে পট দেখে প্রভূত আনন্দলাভ করেছিলেন।

এই সময় আহোম রাজ্যের ক্ষমতা পূর্ব অসমের নামদাঙ্ নদী পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আর নামদাঙ্ নদী থেকে কলং নদী পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর ছিল কাছারী রাজ্য। কাছারীদের প্রচুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় প্রায়ই অসমীয়া ও কাছারীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। তাই ভূঞা সামন্ত নৃপতিরা সুবিধেমত কখনও আলিপুখুরী এবং কখনও টেম্বুয়ানীতে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে যাই হোক, ভক্তি ধর্মে সাধারণের আগ্রহ উপলব্ধি করে উৎসাহিত শ্রীশংকর সর্বসাধারণের বোধগম্য একটি ছোট নাটক লিখে মঞ্চস্থ করার মানসে "ভাওনা" কথা নৃত্য নাটকের প্রচলন করে সম্ভবত সর্বপ্রথম একটি নতুন ধর্মীয় লোকরঞ্জনের ধারা প্রচলন করেন। অনতিকাল মধ্যেই শ্রীমন্তশংকরদেব ভক্তি মার্গের একমাত্র হরিনাম বা "এক শরণ ধর্ম" প্রচারে উৎসাহিত হন এবং কায়মন-বাক্যে এই ধর্ম প্রচারক রুপেই জনমানসে পরিচিত হন। ভাগবত শাস্ত্রের আদি সংস্করণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শ্রীশংকরদেব সর্বপ্রথম এই শাস্ত্র স্থানীয় অসমীয়া ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচনা করায় এই ধর্মশাস্ত্র সাধারণের বোধগম্য হয় এবং জনপ্রিয়তাও লাভ করে। ফলে আপামর জনসাধারণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জীবন ধর্মে নতুন উৎসাহ বোধ করেন। টেম্বুয়ানীতে নতুনভাবে কীর্তণঘর নির্মাণ কালে ভীত খননের সময় পাথর নির্মিত একটি চাতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। কীর্তন ঘরে এই চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুপূজাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই স্থানে ফাগুয়া উৎসব পালন ও কয়েকটি ভক্তিমূলক গীত-রচনা শ্রীশংকরদেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে, এই টেম্বুয়ানীতেই পরবর্তীকালে আধুনিক অসমীয়া ভাষার জনক শ্রীশংকদেব ব্রজবুলী (মৈথিলী) ভাষায় শ্রীমাদ্ভাগবতের রচনা শেষ করেছিলেন।

বিশ্বের বহু সাধুসন্তদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনেক অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের মত শ্রীশংকরের জীবনীতেও একাধিক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা যথা সাধ্য তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকবো। কথিত আছে, এই সময় টেম্বুয়ানীতে ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় পানীয় জলের বিশেষ অভাব হয়। ভক্তবৃন্দের অসুবিধে দেখে শ্রীশংকর সকলভক্তদের হবিষ্যান্ন খেয়ে অহোরাত্রি হরিনাম কীর্তনের আদেশ দেন। কীর্ত্তন চলাকালীন শেষরাত্রে একটা ভয়ংকর শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী একটা বটবৃক্ষ ফেটে গিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি কুণ্ড সৃষ্টি হয়। সে সময় থেকেই টেম্বুয়ানীর পরিবর্তে স্থানটির নাম হয় বটদ্রবা বা বরদোবা এবং কুণ্ডটির নাম হয় আকাশী গঙ্গা। এই সময় শ্রীশংকরের বয়স মাত্র একুশ বৎসর। আধ্যাত্মিক সাধনা ও হরিনাম প্রচারে শ্রীশংকর এই সময় ক্রমে এমন বিভোর হয়ে পড়েন যে, বিষয়কর্মে মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশেষে একদিন খুড়তুতো পিতামহ জয়ন্ত ও মাধব ভুঞার উপর শিরোমণি ভুঞা পদের গুরুদায়িত্ব ভার অর্পণ করে নিজে কায়মনবাক্যে এক শরণ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এদিকে বিষয়কর্মে অমনোযোগ এবং দিবারাত্রি ধর্ম চর্চায় মেতে থাকায় পিতামহী খেরসুতি দেবী ও পিতামহদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অবশেষে একদিন তাঁরা অনতিবিলম্বে শ্রীশংকরের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিনস্থির করে ফেলেন। ১৪৭০ খৃঃ হরিহরগিরীর কন্যা সূর্য্যবতীর সঙ্গে শ্রীশংকরের বিয়ে হয়। সেই সময় শংকরের বয়স ২১ এবং সূর্য্যবতীর বয়স ১৪। বিবাহের ৩ বছর পরে, অর্থাৎ ১৪৭৩ খৃঃ, সূর্য্যবতীর গর্ভে শ্রীশংকরের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। নামাকরণ হয় "মনু" (পরে হরিপ্রিয়া)। এর ঠিক নয় মাস পরে সূর্য্যবতীর অকালমৃত্যুর ফলে শ্রীশংকর সম্পূর্ণভাবে সংসার বিবাগী হয়ে পরেন। পরবর্তী সাত-আট বৎসর এই মহাপুরুষের জীবনালেখ্য সমসামরিক শিষ্য চরিতকার ও পরবর্তী অনিসন্ধিৎসু বিদগ্ধগুণীজনেরা নানা পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ করলেও একথা সহজেই অনুমেয় যে, অবশ্য করণীয় বিষয়কর্ম ব্যতিরেকে আধাত্ম-সাধনা ও শাস্ত্র—ধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও হরিণাম কীর্তনেই এই সময় শ্রীশংকর বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। কন্যার সাত বৎসর (ভিন্ন মতে নয়) বয়স হলে হরি নামক এক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং পরে জামাতা হরি ও তার মাতাকে এনে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বনগয়াগিরী ও জামাতার হস্তে বিষয় সম্পত্তির

ভার অর্পণ করে ১৪৮১ খৃঃ অব্দে (১৪৩০)[৮] ৩২ বৎসর (৩৪ বৎসর)[৯] বয়সে ১৭ জন ভক্ত সঙ্গীসহ সুদীর্ঘকালের জন্য তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশে বটদ্রবা বা বরদোবা থেকে নৌকাযোগে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। চরিত্রকারদের পুথিমতে, এই সতের জন ছিলেন আজীবন সঙ্গী রামরায়, সর্বজয়, পরমানন্দ, বলোরাম, বলভদ্র, গোবিন্দ, নারায়ণ, বড় শ্রীরাম, গোপাল, ছোট বলরাম, মুকুন্দ, মুরারী, মহেন্দ্র, কন্দলী, হরিদাস বণিয়া, দামোদর আতা এবং আরো দুইজন।[১০] শুরুতে ১৪ দিন নদীপথে যাত্রান্তে সম্ভবত রঙপুর থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২ মাস ২১ দিন পর গঙ্গাতীরে পৌঁছেন। সঙ্গীগণসহ সুদীর্ঘ বার বৎসর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ সমাপ্ত করে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে (ভিন্নমতে ১৪৯৫ খৃঃ) নিজগ্রাম আলিপুখুরী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এই ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন চরিতকাযদের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হ'তে দেখা যায়। রামানন্দের মতে ১২ জন ভিন্ন বাকী সঙ্গীগণ গঙ্গাস্নান করে স্বদেশে ফিরে আসেন। সে যাই হোক, শ্রীশংকর গঙ্গা পার হয়ে দশ দিন পর গয়া উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনদিন অতিবাহিত করে আবার ফিরে এসে গঙ্গাতীর থেকে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তিন সপ্তাহ পদব্রজে ভ্রমনান্তে উপনিত হন জগন্নাথ ধাম পুরীতে। বরদোবা চরিত মতে, এই সময় শ্রীশংকর ব্রহ্মপুরাণ থেকে পুরীর পাণ্ডাদের জগন্নাথ মাহাত্ম ব্যাখ্যা করে শোনান। কথিত আছে, এই সময় শ্রীশংকরদেবের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণই কল্পনা প্রসূত। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গদেশীয় কিছু কিছু শিক্ষিত লোকের মনে এমন ধারণাও আছে যে, শ্রীশংকরদেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (জন্ম ১৪৮৫ খৃঃ) বয়সে শ্রীশংকরদেব (জন্ম ১৪৪৯ খৃঃ) থেকে ৩৬ বছরের ছোট। শ্রীশংকরদেবের প্রথম তীর্থ যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে পাঠশালায় পাঠরত ৬—৭ বৎসরের বালক নিমাই। "It is not likely that during his first pilgrimage he (Sankardeva) met the Bengal reformer Chaitanya."[১১] এমনকি প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে (১৫৪০ খৃঃ) (ভিন্নমতে ১৫৫২ খৃঃ) শ্রীশংকরদেবের দ্বিতীয় বার স্বল্পকালের (৬ মাস) তীর্থ ভ্রমণের সময়েও শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫ খৃঃ—১৫৩৯ খৃঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের আনুমানিক উল্লেখ ও ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। আধুনিক কোন বিদগ্ধ জনই ওই মতামত সমর্থন করেন না।

শ্রীক্ষেত্র থেকে শ্রীশংকরদেব বৃন্দাবন যান এবং যাত্রা পথে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু রামানন্দ রচিত শ্রীগুরু জীবনীতে এ কথার উল্লেখ নেই। কথিত আছে, রূপ ও সনাতন গোস্বামী শ্রীশংকরদেবের সঙ্গে সীতা কুণ্ড পৌঁছে তাঁর কাছ থেকে ভক্তি ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করে প্রচারেয় উদ্দেশ্যে বাইরে যাত্রা করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ তনয়। বরদোবা চরিতমতে বৃন্দাবনে আরো অনেক ব্রাহ্মণ তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রীশংকরদেবের শরণ নেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অবশ্য রূপ - সনাতন গোস্বামীর পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পাওয়া যায়।

শ্রীক্ষেত্র থেকে শ্রীশংকরদেব সীতাকুণ্ড, উত্তর বাহিনী গঙ্গা বরাহক্ষেত্র, পুষ্করতীর্থ ভ্রমণান্তে মথুরায় আসেন। ৬ মাস সেখানে অবস্থানের পর দ্বারকাতীর্থ ঘুরে পুনরায় মথুরায় ফিরে আসেন। শ্রীক্ষেত্র থেকে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত রূপ-সনাতন শ্রীশংকরের সঙ্গী ছিলেন। কথাচরিত মতে, পুষ্করতীর্থে কবি গোপীনাথ, গোকুলে রাধাসন্ন্যাসী, কালিয় হ্রদের তীরে রূপ-সনাতন গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস এবং উপদ্বারকায় (মথুরা) রমাকান্ত নামে একজন ক্ষত্রিয় শ্রীশংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোন কোন চরিতকারদের মতে পুরীধামের পাণ্ডার দশজন পুত্রও শ্রীশংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে হয়তো বা তা তাঁর দ্বিতীয় তীর্থ ভ্রমণের সময়ও হতে পারে। কারণ সে বার শ্রীশংকর বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, পুষ্করতীর্থ বা দ্বারকায় যান নি।

কথা চরিতমতে, বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করে প্রথমে শ্রীশংকর হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র এবং পরে বদরিকাশ্রম যান। "মন মেরি রাম চরণহি—লাগু" গীতটি এই স্থানেই রচনা করেন এবং অনিসন্ধিৎসু গবেষকদের মতে এইটিই তার রচিত প্রথম 'বর গীত'। রদরিকাশ্রম থেকে রওয়না হয়ে শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয়, চন্দন সরোবর ইন্দ্রদ্যম্ন ও লোকনাথ এই পঞ্চতীর্থ ভ্রমণের পর প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করে সবশেষে গঙ্গার মোহনায় তীর্থস্নান করে সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে ৪৪ বৎসর (ভিন্নমতে ৪৬ বৎসর) বয়সে একদিন প্রভাতে নিজগ্রাম আলিপুখুরী এসে উপস্থিত হন।

সুদীর্ঘ বার বৎসর পর শ্রীশংকর গ্রামে ফিরে আসায় আপন জন, জ্ঞাতি মিত্র, প্রতিবেশী এবং প্রজাবর্গের আনন্দের সীমা থাকে না। অতি উৎসাহে তাঁরা শ্রীশংকরকে সংসার ধর্মে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করেন, উপদেশ দেন।

খুড়তোতো পিতামহ জয়ন্ত-মাধবও পুনরায় শিরোমণি ভূঞা পদের দায়িত্ব শ্রীশংকরকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অতিবৃদ্ধা পিতামহী খেরস্বতী-দেবীও পুণরায় বিবাহের জন্য বার বার বলেন। এদিকে শ্রীশংকরের বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি দেখে পিতামহ জয়ন্ত-মাধব ভূঞা এবং বয়জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিজনদের অনুরোধ-আজ্ঞা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ফলে শ্রীশংকর অনন্যোপায় হয়ে শেষপর্য্যন্ত বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হন এবং সম্ভবত ১৫৯৫খৃঃ শ্রীযুক্ত রামভূঞার পঞ্চদশী কন্যা কালিন্দী দেবীকে বিবাহ করেন।

কিন্তু দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেও কিন্তু শ্রীশংকরের মন ধর্ম চিন্তা ও ধর্মপ্রচারেই মগ্ন হয়ে থাকে। রাজ্য চর্চ্চায় সম্পূর্ণ অনীহা দেখে ভূঞাগণ শ্রীশংকরকে মাত্র একশত প্রজার দায়িত্ব দিয়ে "গোমস্তা" পদে নিয়োগ করলেন। কিন্তু শ্রীশংকর সেইভার জামাতা হরিকে অর্পণ করে নিজ আকাঙ্খিত আধাত্মসাধন এবং ধর্ম চর্চ্চাতেই দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই সময় তিনি 'গরুর পুরাণ' অবলম্বনে "ভক্তিপ্রদীপ" কাব্য এবং 'হরিবংশ' অবলম্বনে "রুক্মিণীহরণ" নাটক রচনা করেন। গুরু গৃহে ছাত্রাবস্থায় কাব্য ও নাটকের বিষয়ালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বার বৎসরের তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই সময় "চিহ্ন যাত্রা" বা অংকীয়া নাটিকা রচনা শ্রীশংকরেয় জীবনের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। "পারিজাত হরণ", "কালিয় দমন", 'রাস' এবং 'রুক্মিণীহরণ' নাটক অসমীয়া নাট্যকলা তথা ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই সময় শ্রীশংকর ভাগবতের 'পাষণ্ড মর্দন', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'অজামিল উপাখ্যান' ও রচনা করেন এবং ভাগবত অবলম্বণে কীর্তনের ছন্দ, কথা এবং শ্লোক রচনা করে তার অন্যতম ধর্মসাহিত্য কীর্তি "কীর্তন ঘোষ" আরম্ভ করেন। এই সময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে অনেক ভক্ত-শিষ্যগনের ভক্তি-ধর্ম বা এক শরণ নাম ধর্মে দীক্ষা দান। চরিতকারদের মতে প্রথম শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শিক্ষাগুরু মবেন্দ্রকন্দলী, সতীর্থ রাম রাম, চর্তুভূজ, কর্ণস্কর, বিদ্যারত্ন, রামসরস্বতী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ। তদুপরি বুঢ়াখা, সর্বজয়, বলোরাম, হয়িদাস ভূঞা আদি ভূঞাগণ এবং তাঁদের সঙ্গে উরনা, বনরা, বাধবী এবং চন্দরী এবং আরো অনেক গৃহকর্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকেও তিনি এই সময় ভক্তি ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। শ্রীশংকরদেব অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য অনেক সাধক মহাপুরুষের ন্যায় কোনদিনই গৃহকর্ম লজ্ঘন করেননি, বরং বলা যায় তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী-সন্নাসী। স্ত্রী কালিন্দীদেবীর গর্ভে

শ্রীশংকরের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারা ছিলেন রামানন্দ, কমললোচন, হরিচরণ ও কন্যা রুক্মিণী। দ্বিতীয় পুত্র কমললোচন ও কন্যা রুক্মিণীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। বড়ছেলে রামানন্দ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ভক্ত।

এই সময় মধ্য অসমে ভূঞা কাছারীদের বিবাদ-বিসম্বাদ চরম আকার ধারণ করে। সামান্য কারণেই কাছারীরা ভূঞা রাজ্যে প্রবেশ এবং অতর্কিত আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি করতে দ্বিধা করত না। অবস্থা ক্রমশই উদ্বেকজনক হয়ে ওঠায় শ্রীশংকরদের তার শিষ্য-ভক্তদেব নিয়ে বরদোবা ত্যাগ করে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যাত্রাই স্থির করেন এবং একদিন প্রথমে ভক্তদের নৌকাযোগে নদী পার করে নীজে কীর্তন শাস্ত্র খানা হাতে নিয়ে একহাতে সাঁতরে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে যান। এটা সম্ভবত ১৫১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে প্রথম কিছুদিন ভালুকাগুড়ি ও পরে আরও কিছুদিন কোমরাকুটা নামক স্থানে বাস করে পরে গাংমৌ গ্রামে সাত বছর (খৃঃ ১৫১৯-২৪) স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানেই তাঁর প্রথম পুত্র রামানন্দের জন্ম হয়। কথিত আছে, ত্রিহুত থেকে আগত ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী জগদীশ মিশ্র মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের সপ্নাদেশ পেয়ে স্বহস্তে সঠিক ভাগবত (শ্রীধর স্বামীর টীকা সম্বলিত) শ্রীশংকরদেবের কাছে নিয়ে আসেন। প্রতি মাসে এক স্কন্ধ করে পাঠ করে বার মাস পরে পাঠ শেষ হবার পয়েই পরমভুক্ত জগন্নাথ দেহত্যাগ করেন।[১২] শ্রীশংকরদেব অবশ্য ইতিপূর্বেই ভাগবত অবলম্বনে গীত ও নাটীকা রচনা আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ জগদীশ মিশ্র ভাগবত নিয়ে আসার অনেক পুর্বেই কামরূপ রাজ্যে ভাগবত চর্চার প্রচলন হয়েছিল।

এর কিছুদিন পরেই ভুটিয়াদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ, উৎপীড়নের ফলে শ্রীশংকরদেব শিষ্যভক্তগণ সহ গাংমৌ ত্যাগ করেন এবং আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের মাজুলীদ্বীপে পৌঁছে রেলগুড়ি বা ধূঞাহাটা নামক স্থানে বহুদিন পাকাপাকি ভাবে বসবাস করেন (খৃঃ ১৫২৪-৪৩)। এখানে শ্রীশংকরের দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র ও কন্যা রুক্মিণী বা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম পুত্র রামানন্দের জন্ম হয়েছিল পূর্ববর্তী বাসস্থান গাংমৌতে। এই ধূঞাহাটাতেই শ্রীশংকরের আজীবন সঙ্গী এবং উত্তরসুরি এবং অসমের দ্বিতীয় মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমাধবদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। কথিত আছে, শ্রীশংকরের বেদব্যাখ্যা শুনে মাধবদেবের সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে

গুরু মান্য করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চরিকারদের মতে, শ্রীশংকরদেব শিষ্য রামদাসের (পূর্বনাম গয়াপাণি) মুখে গুরুর কথা শুনে মাধবদেব শ্রীশংকরের কাছে এসে উপস্থিত হন। দুই জনের বহুক্ষণ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গাবলী বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কযুদ্ধ হওয়ার পর মাধবদেব পরাজয় স্বীকার করে শ্রীশংকরদেবের শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি, নিজে উপার্জিত বিষয়সম্ভার, এমনকি মঙ্গলাচরণের পরে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করে চিরকৌমার্য্য-ব্রত পালন এবং ধর্ম ও গুরুভক্তির বিরল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মাধবের গুরু নির্দেশিত পথে আজীবন অচল নিষ্ঠা তাঁকে শ্রীশংকরদেবের উপযুক্ত উত্তরসূরি ও মহাপুরুষপদে অধিষ্ঠিত করে। কথিত আছে, শ্রীশংকরদেব নিজে তখনও স্ত্রী কালিন্দিদেবীর সঙ্গে যে যে ভক্তিবিরোধী ভাব সকল দূর করতে অসমর্থ ছিলেন, মাধবদেবের গুণে তা অতিসহজেই সম্ভব হয়েছিল। "মোর মাধবে সমস্ত বুঝতে পেরেছে" শ্রীশংকরদেবের এই উক্তি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বাস্তবিকপক্ষে শংকর-মাধব মিলন অসমের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা। গুরুভক্তি ও ভগবৎ চিন্তার এমন আদর্শ ইতিহাসে বিরল। পরবর্তী ভারতে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেই আবার তা দেখা যায়।

মাধবদেবের জন্ম বর্তমান লখীমপুরের অন্তর্গত নারায়ণপুরের নিকট লেটেকু পুখুরীর পারে শ্রীহরিহর বরার ঘরে।[১৩] তার পিতার নাম শ্রীগোবিন্দ গিরি। চরিতকারদের মতে গোবিন্দ গিরি ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলায় অবস্থিত বাণ্ডকার অধিবাসী। গোবিন্দ গিরির দুই পত্নী, অনুচীতা ও মরোরমা। প্রথম পত্নী অনুচিতার মৃত্যুর পর বাণ্ডুকার রিযয়-সম্পত্তি পুত্র রূপচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে গোবিন্দ গিয়ি বরদোবায় এসে কিছুকাল বাস করেন। কুসুম্বর ভূঞার (ভিন্নমতে শ্রীশংকরদেবের) অনুরোধক্রমে মনোরমা নামে ভূঞা বংশের একটি কন্যাকে গোবিন্দ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই মনোরমার গর্ভে শ্রীমাধবদেবের জন্ম হয় (খৃঃ ১৪৮৯-১৫৯৩)[১৪, ১৫]।

শ্রীশংকরদেব এই ধুঞাহাটায় অবস্থান কালে কীর্তন ঘোষের 'পাষণ্ড মর্দন', 'নামাপরাধ', 'শিশুলীলা', 'রাসক্রীড়া', 'কংসবধ', 'গোপী উদ্ধার সংবাদ', 'কুজীর বাঞ্ছাপূরণ', 'অক্রুর বাঞ্ছাপূরণ' ইত্যাদি অধ্যায় রচনা করেন। চরিতকারদের মতে, এই সময়ে তিনি 'পত্নী প্রসাদ' নাটিকা এবং করেকটি বরগীতও রচনা করেন।

অসম বরঞ্জী (ইতিহাস) মতে এই সময় অহোম রাজ দিহিঙীয়া রাজা (খৃঃ ১৪৯৭-১৫৩৯), যিনি অহোম রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দুনাম গ্রহণ করে "স্বর্গনারায়ণ" নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিলেন, চ্তীয়া বাজ্য (বর্তমান অসমের উত্তরপূর্ব কোণে সদীয়া অঞ্চলে অবস্থিত) অধিকার করেন। আহোম কাছারী যুদ্ধেও আহোমরাজ জয়ী হওয়ায় কলং নদীর তীর পর্য্যন্ত আহোম রাজ্য বিস্তৃত হয় এবং আহোম রাজ বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন হুশেন শাহের আক্রমণে খেন বংশের নবম ও শেষ রাজা নীলাম্বরের পরাজয়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে কামাতা রাজ্য ধ্বংস হয়। এবং এর ফলস্বরূপ কামরূপ-কামাতা রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ায় ভূঞা সামন্তগণ কিছুকালের জন্য পুনরায় প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। কিন্তু ১৫১৫ খৃঃ বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচরাজ্যে তাঁর সুযোগ্যপুত্র নরনারায়ণ (খৃঃ ১৫৩৫-৮৪ অতএব আকবরের সমসাময়িক) প্রভূত পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। নরনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিলা রায়ের (শুক্লধ্বজ) নেতৃত্বে পূর্বদিকে কোচরাজ্য বিস্তার অভিযান অব্যাহত থাকায় শীঘ্রই আহোম-কোচ যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। ফলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে নারায়ণপুর পর্য্যন্ত কোচ রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়। ১৫৬২ খৃঃ চিলারায় দ্বিতীয়বার আহোমদের পরাজিত করে দিখৌ নদী পর্য্যন্ত কোচ রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন।

ইতিমধ্যে শাক্ত-তান্ত্রিক ও কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ শ্রীধর ভট্টাচার্য, কবিরাজ মিশ্র, রত্নাকর কন্দলি, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য আদি পণ্ডিতদের শ্রীশংকরদেব প্রবর্তিত ভক্তি ধর্ম বিরোধী আন্দোলন চরমে পৌঁছেছিল। তাঁরা আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের নিকট বৈদিক আচার বিধি বিনষ্টকারী শ্রীশংকরের বিরুদ্ধে নানা কৌশলে অনেকদিন থেকেই অভিযোগ করে আসছিলেন। ক্ষুব্ধ স্বর্গ নারায়ণ কৌশলে হাতী ধরার কাজে নিযুক্ত আহোম রাজপুরুষদের সহযোগিতা না করার অভিযোগে উচ্চরাজপদাধিকারী সন্দিকৈর দ্বারা কয়েকজন ভূঞাদের সঙ্গে শ্রীশংকরের জামাতা হরি ও শ্রীমাধবদেবকে আহোম রাজধানী রঙপুরে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাজ বিচারে শ্রীশংকরের জামাতা হরির মুণ্ডচ্ছেদন হয় এবং শ্রীমাধবদেব বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পর শ্রীমাধবদেব মুক্তি পেয়ে শ্রীগুরু সমীপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। শ্রীশংকরদেব পরম ভক্ত শ্রীমাধবের নিকট এই নিষ্ঠুর বৃত্তান্ত শুনে আহোম রাজ্যে বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে কামরূপ রাজ্যে চলে যাওরাই স্থির করেন।

শ্রীশংকষদেবের বয়স তখন ৮৭ বৎসর, এবং উল্লেখযোগ্য যে তাঁর রচিত ৬ খানা নাটিকার (পত্নী প্রসাদ, কালিদমন, রাস, রুক্মিণীহরণ, পারিজাত হরণ ও সীতা সয়ম্বর) মধ্যে সর্বপ্রথম 'পত্নী প্রসাদ' নাটিকার রচনা এই ধুঞাহাটাতেই সম্পন্ন করেছিলেন।

ভক্তগণ সহ নৌকাযোগে শিঙ্গরি এবং বরদোবার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লুহিত নদী দিয়ে বরপেটা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে প্রথমে টম্পাববি ও পরে স্যুন্দরী দিয়া গাঁও উপস্থিত হন। কিন্তু এইসব স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহুভক্তজনের অকালমৃত্যুতে ঐ স্থান ত্যাগ করে অবশেষে বরপেটা বিলের পারে পালংদি বা চুনপুয়া নামক স্থানে বসতি করেন এবং প্রায় এক বৎসর সেখানেই বসবাস করেন। এই চুন পোয়োতেই নারায়ণ দাস ঠাকুর (পূর্বনাব ভবানন্দ) মাধব, গোবিন্দ গরমলি, বুড়াগোপাল আদি ভক্তদের শিষ্যত্ব গ্রহণ অসমে ভক্তি আন্দোলন ও একশরণ ধর্ম প্রচারের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৎসরাধিক কাল চুণপোয়ায় বাস করে শ্রীশংকরদেব গণককুচি ৩ মাস ও কুমারকুচি কিছুকাল ভক্তশিষ্যগণসহ ভজন কীর্তন নাম করে অতিবাহিত করে ভক্তিধর্ম প্রচার করন।

এরপর আনুমানিক ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশংকরদেব কুমারকুচি থেকে বর্তমান বরপেটা জেলার পাটবাউসী নামক স্থানে এসে নামঘর স্থাপন করে ১৪ বৎসর (ভিন্নমতে ২১ বৎসর) আধাত্মসাধনা, ধর্মপ্রচার এবং সর্বোপরি সমাজসেবায় অতিবাহিত করেন। চরিতকারদের মতে, শ্রীশংকরদেবের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ কর্মসকল এই স্থানেই সুসম্পন্ন হয়। এই পাট বাউসী অবস্থান কালেই বরদোবার নিকট নলচা হতে শ্রীদামোদরদেব (খৃঃ ১৪৮৮-১৫২০) এবং নারায়ণপুর হতে হরিদেব (খৃঃ ১৪৯৩-১৫৬৮) পাট বাউসী এসে শ্রীশংকরদেবের ভক্তিধর্মে শরণ নেন। বরদোবার সন্নিকট নলঞ্চা বা নলচা গ্রামে শ্রীদামোদর দেবের জন্ম হয়। তার পিতার নাম সতানন্দ বা সদানন্দ। চরিতকারদের লেখনীতে পাটবাউসী অবস্থান-কালে শ্রীশংকর-দামোদরের প্রথম সাক্ষাৎ ও দামোদরদেবের ভক্তিধর্মে দীক্ষা নেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। অহর্নিশি নির্গুণ কৃষ্ণের গুণগান, সঙ্গীদের সঙ্গে হরিনাম কীর্তন চলতে থাকায় পাটবাউসী দ্বিতীয় বৃন্দাবনে পরিণত হয়ে উঠে। "বৈকুণ্ঠ সমান যিটো পাটবাউসী ভৈলা।" শ্রীরামকণ্ঠ ঠাকুর তার গুরু বন্দনায় লিখেছেন,

"শংকর—মাধব—দামোদর একে কায়
তিনিও মূর্ত্তির একো ভিন পর নাই।"

এই সময় চান্দসা নামে একজন অতি অহংকারী মুসলমান দর্জী শ্রীশংকর দেবের সংস্পর্শে আসেন। আধ্যাত্মিকগুণ সম্পন্ন এই মহাপুরুষের সাক্ষাতে অভিভূত হয়ে চান্দসা শ্রীশংকরদেবের কৃপা লাভ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীশংকর এই সময় "নাহি ভকতিত জাতি আচার বিচার" এবং "সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণুবুদ্ধি করি" প্রভৃতি সাম্য মৈত্রীর বাণী প্রচার করে বহু জন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত বৃহত্তর অসমীয়া জাতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই সময়কার শ্রীশংকরদেবের শিষ্য-ভক্তগণের নাম-পরিচয় থেকে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত নানা জাতি-উপজাতিদের এক সূত্রে গ্রথিত করে একজাতি একপ্রাণ করার প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যভক্তদের মধ্যে যথাক্রমে শ্রীমাধবদেব ছিলেন কায়স্থ। শ্রীদামোদর দেব, সর্বভৌমদেব ও পুরুষত্তমদেব ছিলেন ব্রাহ্মণ। নরহরিদেব ছিলেন আহোম, চান্দসা মুসলমান ও জয়হরি জয়ন্তীয়া। নয়োত্তমদেব ছিলেন ভুটিয়া, গোবিন্দ গারো, রাম কাছারী, পরমানন্দ মিরি। শ্রীরাম ছিলেন একজন কৈবর্ত, মাধব মৃতশিল্পী এবং হরিদাস ছিলেন একজন বণিক।[১৮]

আধ্যাত্মিক-ধর্মালোচনার সাথে সাথে শ্রীশংকরদেবের পাটবাউনী সত্র হয়ে উঠেছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একাধারে এই সত্র ছিল একটি আদর্শ পাঠশালা। ভক্ত-শিষ্যরা ছাড়াও চারিদিকের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের লেখাপড়া শেখার সুবন্দোবস্ত ছিল এই আশ্রমে। এ ছাড়া এই সত্র বা আশ্রমে ছিল একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী। এছাড়াও চিত্রালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গোলাবারি, গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্র এবং সর্বোপরি, গ্রাম সমূহে উদ্ভূত নানা সমস্যা মীমাংসার জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত পরিষদ বা গাওসভা।

শ্রীশংকরদেবের এহেন প্রশংসনীয় কার্যাবলীর পুরস্কার স্বরূপ কোচরাজ নরনারায়ণ একরকম জোর করেই তাঁকে ঐ অঞ্চলের গোমস্তা বা এজেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। শ্রীশংকরদেব অবশ্য অতি কৌশলে সেনাপতি চিলারায়ের যিনি ইতিমধ্যে শ্রীশংকরদেবের জ্ঞাতিভাই রামরায়ের কন্যা কমলাপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করে একশরণ নাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সহায়তায় এই রাজকার্য্য থেকে অব্যাহতি পান। পরে অবশ্য এই রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্বভার রামরায়ের উপর ন্যস্ত হয়।

চরিতকারদের মতে এই সময় প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে শ্রীশংকরদেব, শ্রীমাধবদেব

সহ প্রায় ১২০ জন শিষ্য-ভক্ত সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। কিন্তু শ্রীশংকরদেবের সহধর্মিণী মাতা কালিন্দীদেবীর আজ্ঞাক্রমে শ্রীমাধবদেব ভ্রমণ কালে বৃন্দাবন যেতে আপত্তি দেওয়ায়, গঙ্গা, মহানদী ও শ্রীক্ষেত্র দর্শনান্তে ৬ মাস পরে পুণরায় পাট বাউসী ফিরে আসেন।

অসমের নববৈষ্ণধর্মের প্রবর্তক এবং অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতির জনক মহাপুরুষ শ্রীশংকরদেবের জীবন ছিল পৃথিবীর অনেক ধর্ম প্রচারকের ন্যায়, এক অবিরাম রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার ইতিহাস। অল্পকাল পরেই শ্রীবিদ্যাবাগীশ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈদিক কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শে রাজা নরনারায়ণ শ্রীশংকরদেবের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচার একটি সমাজ বিরোধী কর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় নরনারায়ণ শেষ পর্য্যন্ত শ্রীশংকরদেবকে রাজদরবারে উপস্থিত করার জন্য সৈন্যসভাসদ প্রেরণ করেন। সেনাপতি চিলারায়ের সুকৌশল বুদ্ধিমত্তায় শ্রীশংকরদেব বন্দী না হয়ে চিলারায়ের তত্ত্বাবধানে নিজেই একদিন গিয়ে রাজা নরনারায়ণের দরবারে উপস্থিত হন। রাজসভায় তিনি বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করায় মহারাজ নর নারায়ণ সন্তুষ্ট হন অল্পকাল পরে শ্রীশংকর নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

চরিতকারদের মতে এই সময় শ্রীমন্তশংকরদেব এই যাত্রায় প্রায় তিন মাস রাজা নরনারায়ণের রাজধানীতে ছিলেন এবং রাজ আজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিদিনই একবার রাজ সভায় উপস্থিত হয়ে ধর্মালোচনায় বা তর্ক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় দিন, "বন্দে গোবিন্দা গোপীজনমানন্দা", তৃতীয় দিন, "হাসি সভাসদ করু বহুথির। মল্ল নৃপতিক সম নাহিকয় বীর", এবং চতুর্থ দিন, "পেখিয়ে চানুর সভামাঝে যাই। সুনত রাজ-আজ্ঞা রাম গোসাঁই" গীত গেয়ে রাজা এবং সভাসদদের আপ্যায়িত করেছিলেন। কথিত আছে এই সময় একদিন নদীয়া শান্তিপুর হইতে কবিচন্দ্র নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "তিন কুরি তিন জন" শিষ্য নিয়ে তর্কযুদ্ধে দ্বিগ্বিজয় মানষে কোচবিহার রাজসভায় উপস্থিত হন। এবং তর্ক যুদ্ধে শ্রীমন্তশংকরদেবের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে সেই রাতেই রাজধানী ত্যাগ করে পালিয়ে যান। খবর, "শুনি রাজা চাপড় মারিলা বালিশত। খলখলি হাসিলেক হরিষে মনত॥" ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে রাজা নরনারায়ণ এরপর থেকে শ্রীমন্তশংকরদেবকে অবতার জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।[১৮]

জীবন সায়াহ্নে পাট বাউসী ফিরে এসে আশ্রমের সব কাজ সুপরিচালিত

হওয়ার সকল বন্দোবস্ত করে নিজ শক্তি-ভক্তি শ্রীমাধবদেবকে সমর্পণ করে দেন। এবং নিজে পুণরায় কোচবিহার ফিরে গিয়ে রাজধানীর সন্নিকটে কাকতকুটা (বর্তনান নাম মধুপুর) নামক স্থানে নির্জনে প্রায় আড়াই বৎসর কাল সাধন ভজন করে অতিবাহিত করেন। কথিত আছে এই সময় রাজা নরনারায়ণ শ্রীশ্রীশংকর-দেবের নিকট "একশরণ ধর্ম" গ্রহণ করে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তি ধর্মের আদর্শ ভঙ্গের আশংকায় শেষপর্য্যন্ত শ্রীমন্তশংকরদেব মহারাজকে দীক্ষা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।[২০] মহারাজের ক্রমাগত করুণ মিনতি উপেক্ষা করতে না পেরে শ্রীশংকর শেষ পর্যন্ত তাকে শরণ দানে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু আজীবন "কৃষ্ণের কিংকর" কৃষ্ণ প্রাণাগত ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব কি তাঁর বৈষ্ণব ভক্তির জীবনাদর্শচ্যুত হবেন ? তিনি জানতেন তা কিছুতেই হওয়ার নয়। পরদিন উপবাস করে নবনির্মিত ঘরে গভীর আগ্রহে গুরুর আগমণ অপেক্ষায় বসেছিলেন মহারাজ নরনারায়ণ। শ্রীমন্তশংকরদেবকে আনয়ণের জন্য দূত-প্রেরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে শ্রীশংকরের পায়ে যে বিষাক্ত ফোঁড়া হয়েছিল তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির। এমতবস্থায় কোন-ভাবেই তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি রাজদূতকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর উপস্থিত ভক্তদিগকে, "তার যাওয়ার সময় হয়েছে" বলে নতুন বস্ত্র পরিধান করে পদ্মাসনে বসলেন। ভক্ত-শিষ্যরা ভাবলেন গুরুদেব মহারাজকে শরণদানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে অসমের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদের ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসের ২১ তারিখ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বেলা দেড় ঘটিকায় ১২০ বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে ইহলীলা সম্বরণ করেন। কথিত আছে বর্তমান তোরসা নদীর তীরে এই মহাপুরুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

———

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ

ধর্মের ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে মানব সমাজের পরিবর্ত্তন ও প্রগতির সাথে সাথে মানবজাতির ধর্মের বা ধর্মীয় ভাবধারার বিবর্তনও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম কথাটি ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' থেকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণবশত হিন্দুধর্মে নানা বিপ্লব—বিবর্তন সত্ত্বেও মূল ধারাটি অপরিবর্তিত থাকায় আজও তা সনাতন ধর্ম নামেই পরিচিত।

কোনও মানুষই তার সমসাময়িক যুগের প্রভাবমুক্ত নয়। ইংরেজীতে একটা সুপরিচিত কথা আছে—A man is the product of his age. মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে কথাটি আরো সত্য। একজন মহাপুরুষ মাত্র তার যুগের সৃষ্টিই নয়, তিনি যুগ স্রষ্টাও।

শ্রীমন্ত শংকরদেবের সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র ছিল খণ্ডিত ছিন্ন ভিন্ন এবং সর্বোপরি সদা পরিবর্তনশীল। একদিকে দিল্লীশ্বর ছিলেন মোঘল বাদশাহ, ফলে রাজ ধর্ম ছিল ইস্লাম। অন্যদিকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন প্রভাবশালী হিন্দুরাজত্বের অবস্থানের ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রায়ই থাকত উত্তপ্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমুক্ত হিন্দুধর্ম তখনও তার সুপ্রাচীন সনাতন ভাবধারা থেকে স্থানচ্যুত। সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা ও নানা ব্যয় বহুল ক্রিয়াকাণ্ডে জর্জরিত হিন্দুধর্ম ভাবধারাগত প্রাধান্য পেলেও কঠোর রক্ষণশীলতার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তখনও ভক্তির চেয়ে ভয়ের বস্তু। প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থে তাই বৌদ্ধ ধর্মের সরলতা ও ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়াসে এই সময় নব ভক্তি ধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম এই নববৈষ্ণব ধর্ম জনমানসে প্রসিদ্ধিলাভ করে। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীশংকরদেব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ধর্মের প্রবর্তন করেন।

এখানে ভারতে এই নববৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাসঙ্গিক এবং উল্লেখযোগ্য। কারণ শ্রীমন্তশংকরদেব এই ধর্মের উদ্ভাবক নন। তিনি ছিলেন এই ধর্মের প্রচারক।

বৈষ্ণব ধর্মের মূল দেবতা বিষ্ণু। ঋক্‌বেদে বর্ণিত বিষ্ণু; ইন্দ্র কিংবা রুদ্রের ন্যায় তেজস্বী দেবতা নয়। তিনি শান্ত এবং প্রাণীসকলের রক্ষক। (ঋকবেদ ২২। ১৮—২০ অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশণী।) মহাভারতে বিষ্ণু মানুষের রক্ষাকারী দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বর্ণিত যজ্ঞের চরম ফলের বিষয়ে এক তর্কযুদ্ধে বিষ্ণু জয়ী হওয়ায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হন। পরবর্তীকালে বিষ্ণু নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণ অভিন্ন বলে পরিগণিত হন। যেমন, "নারায়ণীয় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" (তৈত্তরীয় আরণ্যক)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্মও ছিল গোপালক সমাজের ধর্ম। একদিকে অনগ্রসর কৃষি প্রধান গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অপরদিকে সামন্তবাদী পশুপালক সমাজ গোষ্ঠী ছিল পিতৃতান্ত্রিক। কালক্রম সমাজে প্রচলিত এই দুই সমাজের ধর্মানুষ্ঠান একে অন্যের উপর নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তদুপরি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যছিল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সংশ্লেষণের ইতিহাস। আশ্চর্য্যজনক এই সমন্বয় ক্ষমতার ফলস্বরূপ বৈদিক দেবতা বিষ্ণুকে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পালক নানা অবতার, যেমন—বামন, কূর্ম ইত্যাতি দশাবতার রূপে বৈষ্ণব ধর্মে গ্রহণ এই সময়কার উল্লেখযোগ ঘটনা। এমনই অনুমান করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ডঃ বি. কে. কাকতি তার Vaisnavite myths and Legends নামক বিখ্যাত গ্রন্থে।[১]

ঐতিহাসিকদের মতে অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত থাকলেও গুপ্তযুগের (৩২০ খৃঃ—৫৪০ খৃঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তই (৩৩৫ খৃঃ—৩৭৫ খৃঃ) প্রথম নৃপতি যিনি সর্বপ্রথম এই ধর্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্মকে রাজ ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ ভারতে নববৈষ্ণব ধর্ম জনমানসে প্রসিদ্ধিলাভ করে। তাৎকালীন বৈষ্ণব আচার্য্যেরা অবশ্য এই ভক্তিধর্মের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের সংযোগ ঘটিয়ে এই ধর্মকে বেদান্তমুখী করেই প্রচার করেন। ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যের নাম নাথমুনি (৮২৪ খৃঃ—৯২৪ খৃঃ) এবং তার পরে সেই বংশের যমুনাচার্য্য।

বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম আচার্য্যদের মধ্যে দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য

রামানুজের (১০১৬ খৃঃ—১১৩৭ খৃঃ) নাম সর্বজন বিদিত। পূর্ববর্তী বেদান্ত ধর্মের পুণঃ প্রতিষ্ঠাতা কেরলের শংকরাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের বিপরীতে তিনি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্তক। এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও বস্তুজগজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও এই দুইটি স্বতন্ত্র সত্বা বলেই স্বীকৃত। ইতিমধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়দেবের গীতগোবিন্দে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রী রাধা এবং রাধাকৃষ্ণের কাহিনী জনপ্রিয় হয়ে উঠে। শ্রীশংকরদেবের রচনায় শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া গেলেও রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী প্রায় অনুপস্থিত। শাক্ত-তান্ত্রিক নানা জাতির সমন্বয় ও সংশ্লেষণে বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠনে দৃঢ় নৈতিকতার প্রয়োজন ভেবেই তিনি এরূপ করেছিলেন বলে আধুনিক অসমীয়া সমাজ বিজ্ঞানীনের অনুমান।

রামানুজের মৃত্যুর পর বৈষ্ণবসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর দেশীয় এবং দক্ষিণ দেশীয়। উত্তরদেশীয় সম্প্রদায় ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক এবং দক্ষিণদেশীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী। অন্ধ্রপ্রদেশের নিম্বকাচার্য্য (১১০০—৬২ খৃঃ) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যস্থতা অবলম্বনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেন। কর্ণাটকের মধ্বাচার্য্য (১১৯৯—১২৭৮ খৃঃ) অবশ্য দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন।

উত্তর ভারতে রামানুজপন্থী বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক রামানন্দ (১৪০০—৭০ খৃঃ)। সর্ব প্রথম তিনিই সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং এই ভাবে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদের প্রয়াস করেছিলেন। তার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে রাই দাস ছিলেন মূচি, সেনা নাপিত, ধন্না চাষী ও কবীর ছিলেন তাঁতী।

চিতোরের বিখ্যাত বৈষ্ণবী মীরাবাঈ ছিলেন রাইদাসের সুযোগ্য শিষ্যা। কবীর (১৪৪০ খৃঃ—১৫১৮ খৃঃ) জন্মসূত্রে হিন্দু না মুসলমান ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ থাকলেও তিনি যে একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন এই বিষয়ে সকলেই একমত। ঈশ্বর অথবা আল্লা যে নামেই মানুষ তাকে স্মরণ করুন না কেন আসলে পরমেশ্বর এক জনই। হিন্দি রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাস (১৫৩২ —১৬২৩ খৃঃ) ভক্তি ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক। পঞ্চদশ শতাব্দীর গুরুনানক (১৪৬৯ খৃঃ—১৫৩৮ খৃঃ) হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ অস্বীকার করে শিখ ভক্তি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫—১৬২৩ খৃঃ) বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ছোট বড় সকলের প্রতি সমান ভালবাসা এবং সব জাতির মানুষকেই ভগবানের সন্তান জ্ঞানে তিনি শিষ্যত্ব দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী মৈথিলী কবি চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভক্তদের ন্যায় প্রেমলীলা বিষয়ক কোন গীত রচনা না করলেও, কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে অখণ্ড প্রেম সে রকম প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস ও প্রচার করেছিলেন।

শ্রীশংকরদেবের প্রায় সমসাময়িক তামিলনাদের বল্লভাচার্য্য (১৪৪৯—১৫৩১ খৃঃ) শুদ্ধদ্বৈতাবাদের প্রবর্তক। দক্ষিণভারতের শ্রীধর স্বামী (পুরীর গোবর্ধন মঠের মহন্ত) ছিলেন শংকরাচার্য্যের অনুগামী। তাঁর মতবাদের প্রভাব অসমের বৈষ্ণব আচার্য্যদের লেখনীতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত শ্রীশংকরদেব পুরী অবস্থানকালে শ্রীধরস্বামীর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তার ফলস্বরূপ শংকরাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের আদর্শ "একশরণ ধর্মকে" প্রভূত প্রভাবিত করেছিল যেমন, "ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে যত দেখা মিছা আন।" (ভাগবত ১২/১৮৪৮৯—৯০ শংকরদেব), আমাদের অদ্বৈতবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা ভক্তি। এই ভক্তি কি এবং এই ভক্তি কেন? "ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি।" (নারদ ভক্তি সূত্র)। ইহা প্রেমামৃত। প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। কিন্তু কেন? উত্তর, "ইহা আমাদের পরমঈশ্বরে—পেঁৗছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা" (পৃঃ ৭, বিবেকানন্দ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড)।

আরো যেমন,

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ"

(গীতা ১২ অধ্যায়)

অর্থাৎ, "আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্যযুক্ত, পরম শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হয়ে যারা আমাকে উপাসনা করেন, তারা আমার (মতে) যুক্ততম (বলে) গণ্য।"

অতএব ভক্তি অর্থাৎ ভগবানে প্রেম, বিশ্বাস এবং অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের দ্বারাই ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব। শ্রীশংকরদেবের রচনায় এই একেশ্বরবাদী মনোভাব বিভিন্ন ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত। গীতোক্তো "সর্বমান পরিত্যেজ্য মামেকং শরণম ব্রজ" ইত্যাদি উক্তির প্রতিধ্বনি আমরা পাই তার ভক্তি প্রদীপ গ্রন্থে,

"এক চিত্তে তুমি মোক করা মাত্র সেবা
পরিহারা দূরতে যতেক আন দেব।"
(ভক্তি প্রদীপ ১০০ ইত্যাদি, শংকরদেব।)

বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতেবর্ণিত নয়বিধ ভক্তির মধ্যে শ্রীশংকরদেব তাঁর রচনায় প্রধানত দুই বিধ ভক্তির উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমবেত কীর্ত্তণ ও শ্রবণ। "শ্রবণং কীর্ত্তণং বিষ্ণোঃ।" সম্ভবত এই কীর্ত্তণ ও শ্রবণের উপর গুরুত্ব আরোপ তার যুগোপযোগী "একশরণ ধর্ম" প্রচারের উপযুক্ত ও কার্য্যকরী বিবেচনা করারই ফলশ্রুতি।

"যদ্যপিত্ত নববিধ ভক্তি মাধবব
শ্রবণ কীর্তনেসে জানা শ্রেষ্ঠতর"
(ভাগবত ১।৩৮, শংকরদেব)

আবার, "......ভক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই। শ্রবণ
কীর্তণ ইটো........."
(ভাগবত ১২।১৮৮৪৬, শংকরদেব)

কিন্তু শ্রীশংকরদেবের ভক্তিধর্ম বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের ধর্ম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি উদাসীন থাকা অনুচিত। এই আলোচনার প্রথমেই অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে ধর্ম হল এক ধরনের ভাবাদর্শ। কার্ল মার্কসের মতে "an inverted world consciousness" বা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক প্রকার উল্টো চেতনা। ফ্রয়েড মনে করতেন ধর্ম একপ্রকার কাল্পনিক রক্ষাকর্তা। তিনি ধর্মকে বলেছেন ছলনা বা মরিচীকা। পিতা মানুষের শৈশব এবং বাল্যের রক্ষাকর্তা এবং পিতৃভাবনাই পরবর্তীকালে অনন্ত বিস্তৃত হয়ে আমাদের ঈশ্বর ভাবনায় পরিণত হয়। তাঁদের মতে মানুষের নানা চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতির মত আধ্যাত্মিকতার মূলও আমাদের এই পার্থিব জগৎ। আর দেবতারা হচ্ছেন আদিম মানবগোষ্ঠীর নেতা বা রাজার প্রতিচ্ছবি। রাজা বা সম্রাট এই পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি, যেমন,—"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" ইত্যাদি ধারনা বা সূত্র অবশ্য সকলেরই জানা কথা। George Thomson-এর ভাষায়, "......The God is to community at large what the chief or king to his subjects......The kings powers appear to be drived from God and

his authority is accepted as the will of God."[২] রাজা যে দৈবিক শক্তির উৎস তা আমাদের স্মৃতি সংহিতায়ও উল্লেখ আছে।

"মহতি দেবতা হেয্যা নররূপেন তিষ্ঠতি।"

(মণু স্মৃতি ৭।৮)

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম, বুদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম একই উৎস থেকে উদ্ভুত হলেও এসব ধর্মের অভুত্থান ছিল এক একটি বিরাট সামাজিক বিপ্লব। যদিও আধুনিককালের সসস্ত্র সামাজিক বিপ্লব থেকে এর প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল আশমান জমিন ফারাক। সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং ব্যয়বহুল ধর্মীয় আচার বিধির ফলে সামাজিক হীণমন্যতা ও নিষ্পেষণের ফলস্বরূপ এই সব ধর্মাশ্রয়ী সামাজিক বিপ্লবের উদ্ভব। যেমন বৌদ্ধধর্ম ছিল বৈদিক কর্মকাণ্ড, ব্যয়বহুল আচার নিষ্ঠা এবং রাজানুগ্রহে ধনবান ব্রাহ্মণদের সামাজিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আর্থ সামাজিক বিপ্লব। পরবর্তীকালে অবশ্য বৌদ্ধদের একাংশের তান্ত্রিকতা অবলম্বন ও অধঃপতনের এলে শ্রীশংকরাচার্য্য বৈদিক ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার মুসলমানদের আক্রমণের ফলে হিন্দুধর্মে উদ্ভুত ক্রমবর্দ্ধমাম সামাজিক কঠোরতার বিরুদ্ধে নববৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান ছিল আরও একটি সামাজিক বিপ্লব।

শাক্ত ধর্ম ছিল মূলত মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর ধর্ম। সম্ভবত প্রকৃতি ও মানুষের উর্ব্বরতা মূলক অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রাণধর্ম ছিল এই ধর্মের উৎপত্তির কারণ।[৩]

শৈব ধর্ম ছিল সম্ভবত কোন অনার্য্য পশুপালক গোষ্ঠীর ধর্ম। শিব নিজে পশুপতি। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে শিবের কোন উল্লেখ নেই। তাঁর একনাম ঈশান অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক। শাক্তদেবী পার্বতী নিঃসন্দেহে পার্বত্য অঞ্চলের দেবী। অর্জুনের কিরাত কিরাতিনী বেশ ধারী শিব-পার্বতীর সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা মহাভারতের বনপর্বে (কিরাতাধ্যায়) উল্লেখ পাওয়া যায়। শাক্ত-দেবী ছিলেন পর্বত বাসিনী। "দুর্গে—কান্তার বাসিনী" (মহাভারত ৬।২৩।১১) ইত্যাদি শ্লোকে তাকে পার্বত্য দেশবাসিনী রূপেই পরিচিত করায়। দেবীর বিভিন্ন নাম যেমন—দুর্গা—দুর্গম অঞ্চলের—অধিষ্ঠাত্রী, পার্বতী—পর্বতের কন্যা, কালী—করালী, কৃষ্ণবর্ণা এবং ভয়ংকরী ইত্যাদি তার পার্বত্য উৎপত্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শাক্তধর্মের এই দেবীকে গিরিজা, শৈলজা, ভৈরবী ইত্যাদি নামে শিবপত্নী হিসেবে গণ্য করে শৈব শাক্ত ধর্মকে পরস্পরের পরিপূরক এমনকি

প্রায় অভিন্ন করে তোলার প্রচেষ্টা ছিল অতি সহজ। তত্নপরি বৈদিক ধর্মের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার প্রভাবমুক্ত এই তুই ধর্মেই পশুবলী, নরবলি, যোনিপূজা, লিঙ্গপূজা, সুরাপান ইত্যাদি ছিল মোটামুটিভাবে বিধিসম্মত। প্রধানত এই সব কারণেই সমাজের শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল বৈষ্ণব ধর্ম। বিদগ্ধ জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী Maxweber-এর ভাষায় "The middle class transformation of religion in the direction of domesticity is illustrated by the emergence of the God—suffused bhakti piety of all Hindu Cult."[৪] তত্নপরি বৈষ্ণবধর্মের আচরণবিধির সরলতা এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি করণে সমাজের মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর সাধারণের মধ্যে এই ধর্ম প্রশস্তি ও প্রসার লাভ করে।

তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আদিম সমাজে না হলেও সমাজ বিভক্ত সমাজে দেবতা ছিলেন গোষ্ঠীনেতা বা পরবর্তীকালে রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধি। এই ভাবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে কোন জমিদার বা সামন্ত রাজার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যের ধর্মীয় প্রকাশের নামই ছিল নিষ্কাম ভক্তি। বৈষ্ণব দেবতা শ্রীকৃষ্ণের একমেব অদ্বিতীয়রূপে এইভাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা যায় শ্রীমদ ভগবদ্গীতায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "ভক্তি" শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাতেই পাওয়া যায়।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস প্রণেতা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে সামাজিক বিবর্তন পদ্ধতির ধ্যানধারণাগত স্বাভাবিক পরিণতিই হল একেশ্বরবাদ যা পরোক্ষভাবে ছিল পিতৃপ্রধান সামন্তবাদী শোষণপদ্ধতির সহায়ক। সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর জগতের প্রভু এবং শাসকবর্গের দৈব প্রতিনিধি যারা মাত্র স্তুতি ও ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন।

অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ধর্মে ঈশ্বর প্রভুত ক্ষমতাশালী রাজারই দৈব প্রতিচ্ছবি, এবং ঈশ্বর তথা গুরুভক্তি হল রাজার তথা সামন্ত প্রভুদের প্রতি সাধারণ প্রজাবর্গের অবশ্য পালনীয় পার্থিব ভক্তির নামান্তর।[৫] শ্রীশংকরদেব প্রমুখ অনেক ভক্তি ধর্মের আচার্য্যদের অবশ্য শিব প্রভৃতি অন্যদেবতাদের প্রতিও অচলা ভক্তি ছিল।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রধানত বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, মানবজাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস আশ্রিত। এতে ভগবানের স্থান নগণ্য এবং

মানবমনের অনুভূতি বা চেতনার ইতিহাস প্রায় অনুপস্থিত। ধর্মের যাবতীয় বস্তুবাদী সমালোচনা অনেকাংশে অবিসম্বাদী হলেও, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের মনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলে এই পার্থিব জগৎ নিশ্চয়ই, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো অতিন্দ্রিয় অনুভূতিগুলোও যে সত্য এবং অনির্বচনীয় মানব মনের প্রকৃত উপলব্ধি তা অনস্বীকার্য্য। এটা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ এবং পর্য্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় শুধু যুক্তি সাপেক্ষ নয়। মানুষের প্রেম—ভালবাসা, দয়া-মায়া-করুণা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, চৈতন্যের গভীরতা তার ধর্মের অঙ্গ। সে সত্যকে চায়, সুন্দরকে চায় এবং একমাত্র ধর্মই মানুষের এই চিরন্তন পিপাসাগুলো মেটায়, আর কোন কিছুই মানুষকে তার এতগুলো আকাঙ্খার তৃপ্তি দিতে পারে না।

সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বায় বহুল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিহার করে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, ভোগবিলাসী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ, সাত্বিক গুণ সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ, জাতিভেদ প্রথার প্রতি ঔদাসীন্য এবং সমাজ সংস্কার ইত্যাদি প্রধান। শ্রীমন্তশংকরদেব যদিও মূর্তি পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না, তিনি মূতিপূজা সমর্থনও করেননি।

"কহি আছে মন্ত্রে যিটো মুৰ্ত্তি মাধবর।
তাত ব্যতিরেকে মূর্তি নাই ঈশ্বরর ॥"

(ভক্তি রত্নাকর—৩৯৬, শংকরদেব)

বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ। ভক্তি বা ভগবৎ প্রেমই এই ধর্মের মূলকথা। যুক্তি-তর্ক-এমনকি জ্ঞান কিংবা যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যিক আচার নয়, একমাত্র ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভ সম্ভব।

"ভকতি সে মাতা ভকতি সে পিতা
ভকতি হে বন্ধুজন।
= = = =
— = = —
ভকতি হে চিত্ত ভকতি হে বিত্ত
ভকতি মোক্ষর বীজ।"

(ভাগবত, দশম স্কন্ধ ১০৮৬-৮৯ শ্রীশংকরদেব)

ভকতি যেমন নয়বিধ যথা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পদসেবা, দাস্য, সখিত্ব,

বন্ধন এবং দেহ অর্পণ, ভক্তও তেমন চারি প্রকার। সংসারী হয়েও যে কৃষ্ণমূর্তির সতত আরাধনা করে সে প্রাকৃত ভক্ত। যে নিরাকার বিষ্ণুর আরাধনা করে সে মধ্যম ভক্ত। যে বৈষ্ণব সংসার ধর্ম করেও সদা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত সে উত্তম ভক্ত, আর যে সংসারে সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে সর্ব জীবে এবং সর্ববস্তুতে হরিকে দেখতে পায় সে মহাভাগবত।

শ্রীমন্তশংকরদেব সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নববৈষ্ণব ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। এই ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

ভক্তি :—প্রকৃত ভক্ত একমাত্র ভগবৎ প্রেমেই মগ্ন থাকেন। তার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এমনকি তিনি মুক্তির প্রতিও উদাসীন। স্বয়ং ভগবান ভিন্ন তিনি আর কিছুই চান না। প্রকৃত ভক্তের অবশ্যই গুরুর প্রতিও অবিচল ভক্তি থাকা আবশ্যক। তিনি গুরু আর ভগবানে অভেদ জ্ঞানে গুরু ভক্তি করেন।

একেশ্বরবাদ :—ভগবানকে সহস্র নামে আরাধনা করা যায়। কিন্তু মূলত তিনি একই ঈশ্বর। তাই তাকে ভিন্ন অন্য কারো পূজা অনুচিত।

"কৃষ্ণহে পরমদেব কৃষ্ণকে করিও সেব
কৃষ্ণকে সর্বদা দিয়া মতি
= = = =
আন কোন দেবে দিব গতি।"

(ভগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ—শ্রীমন্তশংকরদেব।)

একেশ্বর বাদে বিশ্বাস ও ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্তির জন্য শ্রীমন্তশংকরদেব প্রচারিত নববৈষ্ণব ধর্মের আর এক নাম "একশরণ ধর্ম"।

মানবীয় মূল্যবোধ :—অহিংসা, বিনয়, দয়া, ত্যাগ সর্বজীবে ভগবান দর্শন ইত্যাদি শ্রীশংকরদেব প্রবর্তিত ভক্তি ধর্মের ঐকান্তিক বিশ্বাস।

"কুকুর শৃগাল গর্দভেরো আত্মারাম
জানিও সবাকে পড়ি করিবা প্রণাম।"

(কীর্তন—শ্রীশংকরদেব।)

জাতিভেদ প্রথার প্রতি ঔদাসীন্য :—সব মানুষই এক ভগবানের জীব কিংবা অংশ। একশরণ ধর্ম তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই ছিল উন্মুক্ত। কৃষ্ণ নামে সব মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার। শ্রীমন্তশংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি মুসলমানও ছিল।

আচারবিধির সরলতা ঃ—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ এবং অন্যান্য আচার-বিধির ন্যায় কোন আড়ম্বর এই ধর্মে ছিল না। সম্পূর্ণভাবে পৌত্তলিকতা বিরোধী না হলেও পৌত্তলিকতার কোন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, যদিও ব্রহ্ম-সংহতির সত্রগুলোতে আজও নিয়মিতভাবে বিষ্ণু মূর্তির পূজা হয়। একশরণ ধর্ম অতিশয় সহজ সরল। তত্ত্বগতভাবে হরিনাম কীর্তন শ্রবণই এই ধর্মে মুক্তির উপায়। শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত একশরণ ধর্ম নিরাকারবাদী নাম ধর্ম।

"তপ জন যজ্ঞ দান সবে বিড়ম্বন।
কেবল ভক্তিতে তুষ্ট হোন্ত নারায়ণ॥

(কীর্তন ৮১৩—শ্রীশংকরদেব।)

আর এই ভক্তি হবে একনিষ্ঠ, ঐকান্তিক ও অনাড়ম্বর। সবরকম আড়ম্বর ত্যাগ করে পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা তাঁর সানিধ্য লাভ নাম ধর্মের সার কথা। কোনপ্রকার শারিরীক বা আর্থিক ক্লেশ নিস্প্রয়োজন।

"নাই টকা শিকা হানি কৃষ্ণর কথাত।
শরীরতো নাহি শ্রম জানিবা ইহাত॥"

(দশম ১০৮৫১—শ্রীশংকরদেব।)

কারণ,

"তপ জপ যজ্ঞ মহাদান তীর্থস্থান।
কোটি ভাগ নুহি কৃষ্ণ কথার সমান॥"

(ভগবত ১০।১০৬৫৩, শংকরদেব)

অতএব,

"কলি যুগে নাম নাম নামে মাত্রে সার।
নাম এরি নাই নাই নাই গতি আর॥"

(ভক্তিপদীপ-১৫০, ভক্তিরত্নাকর-৭৫, শংকরদেব)

নামঘর এবং মণিকুঠ ঃ—শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত ধর্ম মন্দিরের নাম "নাম ঘর" স্থাপত্য বিহীন একটি অতি সাধারণ ঘর মাত্র। গৃহমধ্যে কোন মূর্তি নাই। অনেক "নামঘরে" মণিকুঠে শিখধর্মের গ্রন্থসাহেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ স্থাপিত অবশ্য অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নানা কল্পনার মূর্তি রক্ষিত দেখা যায়।

স্থানীয় ভাষার উপর গুরুত্ব ঃ—সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হওয়া সত্বেও নব বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রচারকদের স্থানীয় ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ ছিল এই

ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং নতুন পুথি প্রনয়ণ করায় জনমানসে এই ধর্ম সহজে বোধগম্য হয় এবং সহজেই প্রসার লাভ করে।

শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত এক শরণ ধর্মের মূল কথা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত চৈতন্যময় সর্বব্যাপী সূক্ষরূপ এক নিরঞ্জন নারায়ণের সেবা ছিল তার ধর্ম ভাবনার সারকথা। এই নির্গুণ কৃষ্ণের গুন প্রকাশ সাধারণে প্রচার নিমিত্ত তিনি লীলাময় রূপ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বনমালী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে "মত দেখা চরাচর হরিময় নিরন্তর" বোধকরি নিস্কামভাবে একমাত্র ভগবানকেই একান্তমনে ভজনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত প্রেমভক্তি প্রধান বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি উপাসনা প্রচলিত। কিন্তু শ্রীমন্তশংকরদেবের দাস্যভক্তি রাধা বর্জিত। ব্যাসকৃত ভাগবত শাস্ত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। সেব্য সেবকভাবের প্রাধান্য রেখে দাস্য ভাবে কৃষ্ণ ভজনাই ছিল শ্রীমন্তশংকরদেবের একশরণ ধর্মের সারমর্ম। শ্রীশংকরদেব বিরচিত "ভক্তি প্রদীপ" গ্রন্থে তাই আমরা পাই,

"সমস্ত ভূতরে হৃদয়ত আছো আমি।
পরম সুহৃদ মহেশ্বর অন্তর্যামী॥
হেন বুদ্ধি করি সর্বদায়ে জানা মোক।
এতেকে তরি বা সংসার দুখ শোক॥"

(ভক্তি প্রদীপ-১৪৮, শংকরদেব।)

কারণ,

বাহিরে ভিতরে জানা ইটো জগতর।
পরিপূর্ণ রূপে আছো পরম ঈশ্বর॥
জানি ইটো তত্ত্ব কথা থির করিচিত।
মোকেসে দেখিবা মাত্র সমস্ত প্রাণীত॥

(ভাগবত ১৯৩৭৮, শ্রীশংকরদেব।)

'অসমীয়া ভাষার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ' রচয়িতা প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ডঃ বাণীকান্ত কাকতির মতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীশংকরদেবের চতুরঙ্গ দান সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই চতুরঙ্গদান হল— ১) বহু দেবতার মধ্যে প্রধান দেবতার উপলব্ধি এবং তার ফলশ্বরূপ বহু সত্যের মধ্যে সনাতন সত্যের সন্ধানের প্রতি সামাজিক

চৈতন্যের জাগরণ। (২) কর্ম-ধর্মের বিভীষিকা নিবারণ। (৩) বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অন্তরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র এবং (৪) সামাজিক উচ্চ-নীচ শ্রেণীর ব্যবধান অপসারণ। শ্রীশংকরদেব উদ্ভাবিত সত্র এবং নামঘরগুলো শুধু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কেন্দ্রই নয়, সামাজিক শৃঙ্খলারও নিদর্শনরূপে আজও সমগ্র অসমে সুপ্রতিষ্ঠিত।[৬]

অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব গুরুদের ন্যায় শ্রীশংকরদেবও কোন বেদান্তভাষ্য প্রনয়ণ করেন নি। ভাগবত পুরাণই ছিল বেদান্ত ভাষ্যের তুল্য; "সমস্ত বেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।" বিশেষত শ্রীমন্তশংকরদেব একশরণ ধর্ম প্রচার করেছিলেন জনসাধারণের ভিতর আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ও সামাজিক উন্নতি মানষে। প্রখ্যাত অসমীয়া চিন্তাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে একশরণ ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

ঈশ্বর সৃষ্টির আদি ও অন্ত। তিনি কোনদিন ছিলেন না বা ভবিষ্যতেও থাকবেন না এমন নয়। ঈশ্বর থেকেই জীব এবং জগতের সৃষ্টি। তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান। সমস্ত জগত-প্রপঞ্চ সর্বশক্তির আধার অনাদি অনন্ত ঈশ্বর হইতে জন্মায় এবং ঈশ্বরেই পুনরায় বিলীন হয়ে যায়। যেমন,

"তুমি কার্য্য কারণ সমস্তে চরাচর।
সুবর্ণ কুণ্ডলে যেন নুহি ভিন্নতর॥"

(হর-মোহন, শংকরদেব।)

"মঞি মাত্র অবশেষ থাকোহোঁ অন্তত।
কুণ্ডল ভাঙ্গিলে যেন সোনা স্বরূপত॥"

(ভাগবত ২য়, শংকরদেব।)

আবার,

"যত জীব জঙ্গম কীট পতঙ্গম্
অগ, জগ নগ তেরী কায়া।,' (বরগীত, শংকরদেব।)

কিন্তু জীব আর জগৎ কেবলমাত্র মায়াময়, অতএব অনিত্য। এই মায়ার দুই শক্তি—আবরণ আর বিক্ষেপ। এই দুই শক্তি বলেই মায়া সত্যকে ঢেকে রেখে অনিত্যকে প্রত্যক্ষ করায়—

অবস্তুত দেখায় বস্তুক আবরি।
এহিসে মোহর মায়া জানা নিষ্ঠ করি॥

(ভাগবত ২য়, শংকরদেব।)

প্রকৃতি আশ্রয় সংসার বৃক্ষে দুটি পাখীর মত ঈশ্বর ও জীব বাস করে। একটি মুক্ত আর একটি বদ্ধ। "অজ্ঞানতে মূঢ় জনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন।"

(হর-মোহন, শংকরদেব।)

জীব মায়ার দ্বারা পিষ্ট, ক্লেশ কিষ্ট। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। সর্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান। জীব একমাত্র ঈশ্বর-উপাসনা দ্বারাই মুক্ত হতে পারে। "ব্রহ্ম ঈশ—স্বরূপে অন্তর্য্যামী, দ্রষ্টা হৈ উদাসীন হই সর্বজীবে বর্তমান।"

তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ
আমিও অংশ তোমার। (নামঘোষা, মাধবদেব)

পরমার্থ বিচারে জীব-ঈশ্বর ভেদ নাই। শ্রীমন্তশংকরদেবের মতে "দেহ কর্তা মনবেসে জানিবা সংসার।" জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই তিন বৃত্তি যুক্ত ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব যুক্ত মন-স্বরূপ জীব নানা মোহ আর কর্মযুক্ত হয়। এবং তার ফলে পাপ পুণ্যের উদয় এবং কর্ম বন্ধনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিভেদ মায়ার দ্বারা সৃষ্ট বা কল্পিত। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন। "সো অহং......"

"তোমাকে বলিবে দ্বৈত কোন অজ্ঞজন।"

(উরেষা বর্ণন, শংকরদেব।)

ব্রহ্ম ঈশ-স্বরূপে অন্তর্য্যামী, দ্রষ্টা হয়ে উদাসীনভাবে সর্বত্র বর্তমান। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের নিয়ন্তা মহাপুরুষ পরমপুরুষ, পুরুষত্তম কিংবা পরমেশ্বর। এই মহাপুরুষ পরমেশ্বরই শ্রীমন্তশংকরদেবের ভজনীয় পরম দেবতা। আর তার উপাসকগণ ভাগবতের মহাপৌরুষিক বা মহাপুরুষীয়া। শ্রীমন্তশংকরদেব তার "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থে 'পরমগতি-প্রদ-ভজনীয়-পরমদেবতা-মাহাত্ম্য' "শত-অবতার বীজ এবং যার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মাও জন্মলাভ করেছে, সেই নির্গুণ সচ্চিদানন্দ নির্ভেদরূপেই ভজনীয় পরমেশ্বর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি ভাগবতের আদি এবং অন্ত শ্লোকের ধ্যয়—"সত্যং পরম্", শ্রীমাধবদেবের কীর্তন ঘোষর "ব্রহ্মরূপী সনাতন, সর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ।" জ্ঞানদ্বারা তিনি লব্ধ হলেও ভক্তিতেই তিনি সহজলভ্য। তাই ভক্তিই সাধারণের উপযুক্ত পথ। মানবদেহে সকল কর্ম স্খালন করে প্রকৃত ভক্ত জীবন্মুক্তি লাভ করতে পারে।[৮] নারদ পঞ্চরাত্রে যেমন "হৃষিকেশন হৃষিকেশ সেবনম্" অর্থাৎ কেবল মনই নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকেও ইন্দ্রিয়গুলির অধীশ্বরের (ভগবানের) সেবার যুক্ত করতে হবে।

ভাগবতে বর্ণিত নয়বিধ ভক্তির মধ্যে শ্রীশংকরদেব শ্রবণ কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাই তার প্রবর্তিত ধর্মের এক নাম নামধর্ম। সচ্চিদানন্দ সনাতন ব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণের বাহিরে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সব কিছুই মায়ায় সুপ্ত ঘুমন্ত অবস্থায় আছে।

দেখি শুনি মানে ইটো জগত যতেক।
মায়ার রচনা জানা সমস্তে ততেক ॥
(নিমি নরসিদ্ধ সংবাদ ১০১, শংকরদেব।)

সেই সুপ্ত ঘুমন্ত অবস্থা হইতে একবার জাগ্রত হইলে "চিদানন্দ-ঘনস্বরূপে" মিলিত হয়ে যায়। তাই নারায়ণ ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা জড়োপসনা মনে করা হয়েছে। কাজেই "পূর্ণনন্দ সমুদ্রের গোপী ভর্ত্তা" শ্রীকৃষ্ণকেই বিশেষভাবে শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা উপাসনা করতে হবে, আর এই জন্যই নাম ধর্মকে বিশেষভাবে একশরণ ধর্ম বলা হয়েছে।[৭]

অধ্যাপক শিবনাথ বর্মণ তার বিখ্যাত "শ্রীমন্তশংকরদেব কৃতি আৰু কৃতিত্ব গ্রন্থে" বলেছেন, "শংকরীধর্ম ছিল মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের মধ্য তথা নিম্নমধ্য শ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত একটা সংস্কারবাদী আন্দোলন।[১০] কিন্তু স্বর্গীয় কালীরাম মেধির মতে এটা ছিল ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ হিন্দু সমাজের সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ এবং হিন্দুধর্ম বহিভূত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া প্রায় অসম্ভব ভেবে অনন্যোপায় হয়ে ধর্ম ও সমাজকে ভিতর থেকেই সংস্কারের চেষ্টা ভিন্ন অন্য গতি ছিল না। অধ্যাপক বর্মনের মতে বৈষ্ণবধর্ম অন্যায় এবং উৎপীড়ন নির্মূল করার সরাসরি কার্যকরী পন্থা নিতে অপারগ হওয়ায় বা অসম্ভব মনে করায় দুঃখপূর্ণ বাস্তব জগতকে পরিহার করে চিরশান্তিময় ধর্মীয় জগৎ কল্পনা করে তাতে মানসিকভাবে বাস করা বা গ্রহণ করার আহ্বান। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের শংকরী ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছিল অতিশয় স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিকভাবে ভগবান গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং আরো ভয়ংকর আর্থ সামাজিক বৈষম্য এমনকি "বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকলের" (স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৪০) আমূল পরিবর্তন অসম্ভব ভেবে শ্রীশংকরদেব পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আচার্য্যদের ন্যায় দুঃখময় সমাজ থেকে বাইরে এসে আনন্দময় ভক্তি ধর্মের (অলীক !) আদর্শ জীবনে প্রবেশ করার আহ্বান করেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের সংঘ জীবনের আদর্শে শ্রীমন্তশংকরদেব উদ্ভাবন করেছিলেন সত্রানুষ্ঠান, সত্র অর্থাৎ সৎলোককে যে ত্রাণ করে। সত্রের জীবন ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী জীবন। সেখানে কোন প্রকার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না, সব ভক্তের স্থান ছিল সমান। প্রেম-ভক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্রের বৈষ্ণব ভক্তগণ ছিলেন ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক। জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক সাধারণ অন্নবস্ত্রের বেশী আর কিছুই তাঁদের প্রয়োজন ছিল না।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, "সমস্ত (বৌদ্ধ) আন্দোলনের পরিণতি হয়েছিল বাস্তব জগৎ অস্বীকারী এক ভাববাদ, যা ছিল বিজ্ঞানের শত্রুতাত্মক এবং অন্ধবিশ্বাসের অনুগ্রাহী" (Indian Philosophy—by Debiprasad Chattapadhay, Page 139.) অসমের শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত একশরণ ধর্মের প্রায় একই পরিণতি হয়েছিল। রাজানুগ্রহ আর প্রজাদের দান দাক্ষিণ্যের ফলে সত্রীয় ভক্তবৃন্দ হয়ে উঠেছিলেন শ্রমবিমুখ। অধ্যাপক শিবনাথ বর্মনের ভাষায় "অপ্রিয় হলেও এই কথা সত্য যে শংকরী আদর্শ ছিল মূলত শ্রমবিমুখী··· সপ্তদশ শতাব্দীর পদাধর সিংহর মহন্ত নির্য্যাতনের অন্যতম কারণ ছিল এই শ্রমবিমুখতা।[১২]

কিন্তু এই শ্রমবিমুখতা কোন কোন যুক্তিবাদী মনে অলসতার সামিল বিবেচিত হতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে সত্রে বসবাসকারী ভক্তদের জীবন ছিল অক্লান্ত কর্মময় জীবন যদিও সাধারণ গৃহীর কর্ম জীবন থেকে তা ছিল অনেক ভিন্ন ধরনের। শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন গৃহী—সন্নাসী। কোন ভক্তকেই তার সংসার ত্যাগের উৎসাহ দানের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বরং বরদোবা চরিত মতে (পৃঃ ২৫—২৬) খেতি বাতি বা ব্যবসায় বাণিজ্যদ্বারা সম্পত্তি সঞ্চয় করায় শংকরী গুরুজনদের কোন আপত্তি ছিল না। শ্রীমন্তশংকরদেবের সংগ লাভ করার পূর্বে ঠাকুর আতা ছিল বড় একজন সওদাগর। আহোম এবং কামরূপ রাজ্যের বাইরে ও পূর্বে গারো পাহাড় ও উত্তরে ভূটান পর্য্যন্ত ব্যবসায় করে তিনি প্রচুর ধনবান হয়েছিলেন। শ্রীশংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরেও তার ব্যবসায়ে কোন বাধা ছিল না এমনকি তিনি পরিপূর্ণ গ্রাহস্থ্য জীবন যাপন করতেন এবং শ্রীশংকরদেব তাকে কোন দোষারোপ করেন নি। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে তিনি অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না যদি তা আসক্তিহীণ হয় এবং নিস্কাম ভক্তির পক্ষে বাধা না হয়ে দাড়ায়।

ভাবাদর্শ অর্থনৈতিক জীবনের উপর নির্ভরশীল হলেও পক্ষান্তরে ইহা অর্থনৈতিক জীবনকে সুদৃঢ় করে। শ্রীমন্তশংকরদেবের তিরোধানের পরে সত্র সমূহে ধর্ম উপদেশের সাথে সাথে উন্নত কৃষি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা এবং নানা প্রকার বয়ন ও কারুশিল্পের উৎপাদন ও শিক্ষাদান ইহার প্রমাণ বহন করে।

এইসঙ্গে অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য্য যে শ্রীমন্তশংকরদেবের তিরোধানের পর সত্রাধিকারীদের মধ্যে নাম ধর্ম আচরণের আচার অনুষ্ঠানের বিষয় মতবিরোধ দেখা দেয়। নিজ নিজ মতাদর্শের প্রতি ভক্ত মহন্তদের অনমণীয় মনোভাবের জন্য একশরণ নাম ধর্ম আচার ভেদ অনুযায়ী ব্রহ্ম-সংহতি, নিত্য-সংহতি, পুরুষ-সংহতি, কাল-সংহতি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায় এবং তার ফলে অসমে বৈষ্ণব ধর্মের "এক জাতি এক ধর্মের" ভিত দুর্বল হয়ে পরে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক

অসমীয়া ভাষার প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা বলেছেন শ্রীমন্তশংকরদেবের সমগ্র সাহিত্য কৃতিই অনুবাদ এবং সংকলন, তিনি কোন নতুন ধর্ম বা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। সর্বভারতীয় ধর্ম গ্রন্থ বা ধর্মীয় উপাখ্যান অসমীয়া ভাষায় রূপান্তর করেছেন মাত্র।[১]

বিংশ শতাব্দীর সাধারণ পাঠক, এমনকি বিদগ্ধ গবেষকদের পক্ষেও ডঃ শর্মার এই উক্তি নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য্য মনে হবে। শ্রীমন্তশংকরদেব কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নি ঠিকই, কারণ তার "একশণ ধর্ম" ব্যাসদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে বিহিত "দাস্যভাবে" সর্বান্তকরণে এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের শরণ, মনন ও সেবা মাত্র। কিন্তু শ্রীমন্তশংকরদেবের সাহিত্য সম্ভার প্রধানত অনুবাদ এবং সংকলন হলেও আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ নয়। সর্বভারতীয় ভক্তি ধর্ম তথা ধর্মতত্ত্ব বিধৃত পৌরাণিক কাহিনী সমূহের কোথাও বর্জন আবার কোথাও নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কাহিনী সংযোজন করে অসমের স্থানীয় পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উপযোগী করে প্রনয়ণ শ্রীমন্তশংকরদেবের এক অবিস্মরণীয় সাহিত্য কীর্ত্তি। এবং প্রখ্যাত অসমীয়া সমালোচকদের মতে বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসেবেও এক অমূল্য সম্পদ। স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, ভাষাবিদ ডঃ বাণীকান্ত কাকতি এবং বর্তমান যুগের বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগ, ডঃ হীরেণ গোহাঞি প্রমুখ শ্রীমন্তশংকরদেবের বিভিন্ন গ্রন্থের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক মূল্যায়ন করেছেন। সে আলোচনার অবকাশ আমাদের এই গ্রন্থে নেই। তবু আজ থেকে পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নানা জাতি-উপজাতিদের মনে শ্রীশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সম্ভার কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মনে রেখেই আমাদের তার সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে হবে।

মহৎ সাহিত্য কালজয়ী। তা কখনই অনুবাদ বা সংকলন নয়, যদিও হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল, সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভগবদ্গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ

পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুদিত হয়ে ভাব ও ভাষাগত ভাবে কালজয়ী সাহিত্য হিসেবে আজও বিবেচিত হয়। আবার, সাহিত্যের মহত্ব কেবল তার বিষয় বস্তুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। ধর্মীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনকি শুধু আংগিকের বিচারেও সাহিত্যের মহত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন।

সর্বভারতীয় বৈষ্ণব কবিগণ "কেবল সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য" সৃষ্টি করেননি। বৈষ্ণবধর্ম তথা ভক্তি ধর্ম প্রচার এবং প্রসারই ছিল তাদের সাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীমন্তশংকরদেব সাহিত্য রচনা করেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য, এবং তাই তিনি ছিলেন অংশত দায়বদ্ধ সাহিত্যিক। তা সত্যেও, তার রচিত সাহিত্য সম্ভার সাহিত্যরস বিবর্জিত নয়। আংগিকের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। "হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে" তিনি লিখেছেন,

কঠোরক ভয় কথার আশয়
দিলো কিছো কাব্যরস।
নবিচারি তাক হঠাতে আমাক
নিদিবাহা অপযশ ॥
বণিয়াসকলে স্বুবর্ণ গঢ়য়
অলংকার ভাল ভাল।
সিয়ো আনি যেবে স্বুয়গা নেদেয়
স্বুবর্ণ নাযায় জাল ॥[২]

আরো আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত বিপুল সাহিত্য সম্ভার অসমকে শুধু সর্বভারতীয় চৈতন্যের সাথে ঐক্য স্থাপনে সাহায্যই করেনি, বৈষ্ণব সাহিত্যকে অসম-এর জাতীয় সাহিত্য রূপেও প্রতিষ্ঠিত কবার গৌরবের অধিকারী। সর্বোপরি আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, শ্রীশংকরদেবের সাহিত্য শুধু অসমীয়া ভাষার ভিত্তিই সুদৃঢ় করেনি, তার পরিসর বৃদ্ধি, নতুন ছন্দ প্রনয়ণ, নাটকের উপযোগী গদ্য রচনা ইত্যাদি যোগ করে ভাষার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিও তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ আমরা পাই আজকের সমৃদ্ধ সমুন্নত আধুনিক অসমীয়া ভাষা সাহিত্য।

প্রখ্যাত অসমীয়া পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগ শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত সমগ্র সাহিত্য কৃতি মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—(১) উপাখ্যান যেমন –হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, রুক্মিণীহরণ উপাখ্যান ইত্যাদি, (২) রামায়ণ,

ভাগবত ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, (৩) তত্ত্বমূলক গ্রন্থ যেমন, অনাদিপাতন, নিমি-নরসিদ্ধ সংবাদ, (৪) কীর্ত্তন ঘোষা, (৫) গীত—বর গীত, ভাটিমা (স্তুতি) এবং (৬) অঙ্ক বা অংকীয়া নাট।[৩] শ্রীমন্তশংকরদেবের বিভিন্ন রচনাবলীর সময় তারিখ ইত্যাদি প্রনয়ণ খুবই দুঃসাধ্য। ডঃ নেওগ গুরুচরিতকারদের নানা সময়ের উল্লেখ ও তাঁর রচনার বাহ্য আংগিকের অনুশীলন দ্বারা নিম্নলিখিত একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন ঃ—

১। আদিকাল বা বারভূঞা রাজ্যে অবস্থানকাল ঃ—

(ক) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান—মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে।

(খ) ভক্তিপ্রদীপ—গরুড় পুরাণ অবলম্বনে।

(গ) কীর্তন ঘোষার উরেষা-বর্ণন—ব্রহ্মপুরাণ অবলম্বনে।

(ঘ) রুক্মিণীহরণ কাব্য—হরিবংশ অবলম্বনে।

(ঙ) 'মন মেরি রামচরনহি লাগু' প্রথম বর গীত।

(চ) ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ বা অজামিল উপাখ্যান।

(ছ) ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধ বা গজেন্দ্রোপাখ্যান।

(জ) প্রহ্লাদ চরিত্র (তৃতীয় ও সপ্তম স্কন্ধ) হরমোহন, বলিছলন, গজেন্দ্রোপাখ্যান (অষ্টম স্কন্ধ) চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণন।

(ঝ) গুণমালা—দ্বিতীয়—ষষ্ঠ অধ্যায়।

২। মধ্য বা অসম রাজ্যে অবস্থান কাল (১৪৩৮ শকাব্দ হইতে ১৪৬৫ শকাব্দ)।

(ক) কীর্তন ঘোষার পাষণ্ডমর্দন, নাম অপরাধ—ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ এবং সুত-সংহিতা।

(খ) পত্নী প্রসাদ নাটক—ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে।

(গ) কীর্তন ঘোষার শিশুলীলা, রাসক্রীড়া, কংসবধ, গোপী উদ্ধার-সংবাদ, কুঁজীর বাঞ্চাপূরণ, অক্রুর বাঞ্চা-পুরণ।

৩। শেষকাল বা কোচরাজ্যে বসবাস কাল (১৪৬৫ শকাব্দ হইতে ১৪৯০ শকাব্দ)

(ক) বলিছলন—ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধ অবলম্বনে।

(খ) অনাদি পাতন—ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ অবলম্বনে।

(গ) কীর্তন ঘোষার—জরাসন্ধ—যুদ্ধ, কাল যবন-বধ, নারদের কৃষ্ণ

দর্শন, বেদস্তুতি, লীলামালা ইত্যাদিসহ শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ এবং ভাগবতের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

(ঘ) ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ইত্যাদি স্কন্ধের পূর্ণ অনুবাদ, কুরুক্ষেত্র, নিমি—নরসিদ্ধ-সংবাদ, গুণমালা প্রথম অধ্যায়।

(ঙ) রামাযণ, উত্তর কাণ্ড।

(চ) গীত-বর গীত সংকলন, তোটয় ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান, ভটিমা।

(ছ) প্রকরণ গ্রন্থ—ভক্তিরত্নাকর।

(জ) অংকীয় নাট বা নাটক—কালিয়দমন, কেলি গোপাল, রুক্মিণীহরণ, পারিজাত হরণ এবং শেষ নাটক রামবিজয়।[৪]

উপরি উক্ত তালিকা শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা নয়। পণ্ডিত মহলে এমনকি চরিতকারদের লেখনিতেও এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় কারণ অনেক রচনায় শ্রীমন্তশংকরদেব নিজের নামের পরিবর্তে শুধু "কিঙ্কর" বা "কৃষ্ণের কিঙ্কর" ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।

ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে শ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য "ভক্তিরত্নাকর" আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আলোড়নের স্পন্দনে সঞ্জীবিত এই গ্রন্থখানি "এক শরণ নাম ধর্মের" মূল রচনা। ভক্তি ধর্মের সারতত্ত্ব ভাগবত পুরাণ, ভাগবদ্ গীতা, বিবিধ পুরাণাদি, ভক্তিযোগের যাবতীয় বিষয় প্রায় চল্লিশ অধ্যায়ে বিস্তারিত কবিত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিপূর্ণ একখানি প্রামাণ্য রচনা। এই সাথে "ভক্তি প্রদীপ" "অনাদি-পাতন" এবং "নিমি নরসিদ্ধ সংবাদ" অধ্যয়ন করলে শ্রীমন্ত শংকরদেবের আধ্যাত্মিক দর্শন বা ভক্তি ধর্মের পরিপূর্ণ অনুধাবন সহজসাধ্য হয়। 'অনাদি-পাতন' সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রলয়ের বর্ণনা। "ভক্তি-প্রদীপ" গীতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন। 'নিমি নরসিদ্ধ সংবাদ' নিমি রাজা এবং হরি, কবি ইত্যাদি নয়জন সিদ্ধপুরুষের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ভক্তি তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীমন্তশংকরদেব নাম ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা এই ধর্মের লক্ষণ এবং মহিমা নিরূপণ করেছেন। ভাগবত পুরাণ, ভগবদ্গীতা, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি আকর গ্রন্থ অবলম্বনে, (১) ভক্তি-জ্ঞান-পদ গুরুর মাহাত্ম্য (2) নৃ-দেহ-মাহাত্ম্য (৩) সৎ সঙ্গ মাহাত্ম্য (৪) ব্রহ্মরূপী সনাতন মাহাত্ম্য ও (৫) হরিনাম কীর্ত্তন মাহাত্ম্য ইত্যাদি প্রায় চল্লিশটি ভক্তিধর্ম মাহাত্ম্য সাধারণের

বোধগম্য অথচ কাব্যিক ভাষায় এই গ্রন্থে পরিবেশিত। শেষে একটি কৃষ্ণ স্তোত্র এবং শ্রীমন্তশংকরদেবের বিখ্যাত সংস্কৃত তোটক ছন্দে রচিত স্তোত্রটি দিয়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। নিম্নে উদ্ধৃত ভক্তি রত্নাকরের কয়েকটি পদে সাধারণে বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় ভক্তি ধর্মের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সমন্বয় প্রণিধান যোগ্য।

সমস্ত শাস্ত্রর সার উদ্ধারিয়া আনি।
দেখাইল বিদিত করি প্রভুচক্রপানি॥
যিটোশাস্ত্র কহিলন্ত দৈবকীতনয়।
সেহি মাত্র শাস্ত্র এক জানিবা নিশ্চয়॥
দৈবকীর পুত্র এক কৃষ্ণ মাত্র দেব।
ধর্ম্মো একমাত্র সেহি দেবতার সেব॥
মন্ত্রো এক তান নামে কৃষ্ণ অবতার।
ভগবন্তে ইটো করিলন্ত সারোদ্ধার॥

(ভক্তি রত্নাকর ১৮২-৮৩ শংকরদেব)

এবং,

ইটো জগতর তুমি আদিমধ্য অন্ত।
তুমি বিনে আন একো বস্তু নাহিকন্ত॥
যেন ঘট মাটি ব্যতিরেকে আন নাই।
ঘট ভাঙ্গিলেও মাটি হোয়া সমুদায়॥

(ভক্তি রত্নাকর ১৩০-৩২ শংকরদেব)

আবার,

ভকতি সুখত যার নিমজিল মন।
ক্ষুদ্র স্বর্গ সুখে তার কিন প্রয়োজন॥
যিটো ক্রীড়া করে অমৃত সাগরত।
তার কিন কাজ আছে বৃষ্টির জলত॥
গর্তর জলয় সম স্বর্গসুখচয়।
ইয়াত তোমার প্রয়োজন নাহিকয়॥

(ভক্তি রত্নাকর —৪২৪, শংকরদেব)

সংস্কৃত ভাষায় তোটক ছন্দে রচিত স্তোত্রটি শ্রীমন্তশংকরদেবের সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং বহুল আলোচিত। স্তোত্রটির প্রত্যেক পদে

দু'টি লঘু যুক্ত এবং একটি গুরু মাত্রা চারবার এবং প্রত্যেক পদের প্রথম দু'টি অক্ষর পূর্ববর্তী পদের শেষ দু'টি অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। শ্লোকটির পদবিন্যাস নিম্নরূপ[৫] :

মধুদানব দারণ দেব বরং
বর বারিজ লোচন চক্রধরম্ ।
ধরণীধর ধারণ-ধ্যেয় পরং
পরমার্থসিদ্ধ্য (বিদ্যা) শুভ নাশ করম্ ॥

অনুবাদ :—যিনি মধু নামক দানবহন্তা, দেবশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট পদ্মদলের ন্যায় আয়তনেত্র চক্রধারী মস্তকোপরি গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণকারী জগতের মধ্যে ধ্যেয় শ্রেষ্ঠ ও যিনি ভক্তের পরমার্থ মোক্ষ সিদ্ধি প্রদান দ্বারা জাগতিক জপত্রয়াত্মক অশুভ সমূহকে ধ্বংস করেন সেই হরিকে প্রণাম করি।

করচূর্ণিত—চেদি (দী) পভূবিহগং
ভগভূষণ—কার্চিত পাদযুগম্ (কোপচ্চিত পদযুগম্) ।
যুগনায়ক—নাগর বেশরুচিম্
রুচিরাংশচি ধাং শরীর-শুচিম্ ॥

অনুবাদ :—যিনি চেদি দেশাধিপতির রাজ্যের বিভগ অর্থাৎ বিশিষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সমূহকে কর গ্রহণস্থলে বিধ্বংসকারী ভগভূষণ, অর্থাৎ শিব কর্তৃক যারপাদদ্বয় পূজিত এবং যিনি সত্যাদি যুগচতুষ্ঠয়ের নায়কবেশে বিদগ্ধ গুণীজনের পরিচ্ছদ ধারণে রুচি সম্পন্ন এবং মনোহর কিরণদ্বারা আচ্ছাদিত যাহার শরীর চির পবিত্র সেই হরিকে প্রণাম করি।

শুচি চামর বায়ু নিষেব্যতনুং
তনুমধ্যগ দেহ-সুবেশ হনুম্ ।
হনুমত্ত হরীশ সহায় রতং
রতরঙ্গ পরায়ণ শত্রু ণতম্ ॥

অনুবাদ :—পবিত্র চামর সঞ্চালিত বায়ুদ্বারা যাহার দেহ সেবিত হয়, দেহমধ্যভাগ কটিদেশ যাহার ক্ষীণ অর্থাৎ সুলক্ষণ যাহার হনু (সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্র) সুবেশ (শোভন পরিচ্ছদ যুক্ত) হনু (জানু) মত্ত (গর্বিত) যে হরীশ (কলিরাজ সুগ্রীব) তাহার সাহায্য কর্মে যিনি সর্বদা রত থাকেন এবং রত (কামক্রীড়াদি) রঙ্গ (আমোদ প্রমোদাদি) বিষয়ে উন্মত্ত অর্থাৎ দুশ্চরিত্র শত্রুগণকে অবণত করেন সেই হরিকে প্রণাম করি।

নত বর্তুল স্থল সুদীর্ঘ ভুজং
ভুজ গাধিপ তল্প শয়ান মজম্ ।
অজরামর বিগ্রহ বিশ্ব গুরুং
গুরু গোধন কামদ কল্পতরুম্ ॥

অনুবাদ :—যিনি কোমল অথচ গোলাকার তালবৃক্ষ বৎ দীর্ঘবাহু সমন্বিত অনন্ত নাগশয্যায় শয়নকারী জন্মরহিত জরামৃত্যু বর্জিত বিগ্রহধারী সমগ্র বিশ্বের পূজনীয় অত্যুৎকৃষ্ট গোপ-সম্পত্তিমান ও কল্পবৃক্ষবৎ যথেচ্ছ অভীষ্টদাতা সেই হরিকে প্রণাম করি ।

তরুণীমতি (মন) মোহন সর্বশুভং
শুভমঙ্গলদায়ক নীলপিভম্ ।
ইভ কুম্ভজ মৌক্তিক মাল্যবহম্
বহলোরস মিষ্টদ সর্বসহম্ ॥

অনুবাদ :—যিনি সৌন্দর্য্যাদি গুণে যুবতীগণের বুদ্ধিমোহনকারী সর্ববিধ শুভ সম্পাদন নিপুণ, শুভ ও মঙ্গলদানে পটু, নীলবর্ণদীপ্তি সমন্বিত হস্তি কুম্ভজাত মুক্তার মাল্যধারণকারী, বহলোরস অর্থাৎ দৃঢ়বক্ষযুক্ত অভীষ্টদাতা ও দুঃখাদি সর্ব বিষয় সহনক্ষম সেই হরিকে প্রণাম করি ।

সহসায়ত পদ্মদলাফ—(পদ্মলাক্ষ) চিদং
চিদনন্ত—(চিদানন্দ) বিনোদন—বেদবিদম্ ।
বিদুষামতিমোহন (বিদুষামনমণ্ডল) কম্বুগলং
গলশোভিত কৌস্তুভ ভীম বলং ॥

অনুবাদ :—পদ্মদলের ন্যায় দীর্ঘ ও হাস্যযুক্ত নেত্রদ্বয় যাঁহার, যিনি জ্ঞানময়, যিনি জ্ঞানের সহিতই নিরন্তর ক্রীড়াকরেন অর্থাৎ যাহার জ্ঞানের প্রকাশ কখনও বিচ্যুত হয় না, যিনি বেদজ্ঞ, যাঁহার কম্বুচিহ্নিত গলদেশ পণ্ডিতগণেরও চিত্তাকর্ষক হয়, যাঁহার গলদেশে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে এবং যিনি ভয়ংকর বলশালী তাঁহাকে প্রণাম করি ।

বলভদ্র সহোদর সত্য বপুং
বপুরার্দিত বিশ্ব মুরারি রিপুং ।
রিপু যূথপ যূথপ দর্পহরং
হর মোলী নিঘৃষ্ট পদাব্দ পরম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি বলরামের আবির্ভাব কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন ; যে মুর নামক অসুরটি সমগ্র বিশ্বকে শারীরিক শক্তি দ্বারাই পীড়া দিত বলিয়া সে বিশ্বেরই শত্রু হইয়াছিল। যিনি এতাদৃশ বিশ্বশত্রু মুর নামক অসুরকে হণন করিয়াছেন, যিনি শত্রুগণের দলপতি সমূহের দলপতিকেও পরাজিত করিয়া তাহাদের অহংকার চূর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার পাদপদ্মে শিব প্রণাম করিয়া মস্তকদ্বারা তা স্পর্শ করেন তাঁহাকে প্রণাম করি।

পরলোক সহায় সহস্র মুখং,
মুখরালি কুলাকুল মাল্য সুখং।
সুখ মোক্ষদ দক্ষ রমা রমণম্ ;
মনসা পরিমেয় সহস্রফলম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহাদের উত্তম স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য পাপক্ষালন দ্বারা সাহায্য করেন, বেদে যাহাকে সহস্রশীর্ষা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, যিনি গুঞ্জনমুখরিত ভ্রমর সমূহের দ্বারা ব্যাপ্তমাল্য ধারনে আনন্দ লাভ করেন, যিনি ভক্তগণের সুখ ও মোক্ষদানে দক্ষ এবং লক্ষীপতি, যাঁহার সহস্রফণা অর্থাৎ অনন্ত প্রকার গতি মনের দ্বারাও কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে প্রণাম করি।

ফণিতোঽস্মি ণতোঽস্মি হরিং,
হরি বৈরি কৃতামণ ভোগ্য হরিম্।
হরি কিঙ্কর শঙ্কর ঈশপদে
পদমিচ্ছতি গায়তি চামৃত দে ॥

অনুবাদ ঃ—বিষ্ণুর শত্রুগণ কর্তৃক যে সকল রাজ্যাদি অধিকৃত হইয়াছিল, যিনি সেই সকল রাজ্যাদির ভোগ্য সম্পদ সমূহকে বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তদবধি সেই হরি অর্থাৎ বিষ্ণুকে আমি শংকর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আমি তাঁহাকে পুণঃ পুণঃ প্রণাম করিতেছি। বিষ্ণুভক্ত আমি, সেই শংকর মোক্ষদানে সমর্থ সেই বিষ্ণুর চরণে স্থান লাভের ইচ্ছা করিতেছি। আমি শংকর তাঁহার গুণসমূহকে গান করিতেছি।

কোচবিহার নৃপতি রাজা নরনারায়ণের রাজসভায় শ্রীমন্তশংকর দেবের বিচার পর্ব তাহার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। চরিতকারদের মতে শ্রীমন্তশংকরদেব উপরিউক্ত স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে

সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া রাজসভায় আসন গ্রহণ করিলে, রাজা নরনারায়ণ উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিতে বলেন। কিন্তু কেহই কোন অর্থ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীমন্তশংকরদেব প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যা-সহ অর্থ প্রকাশ করিলে বারাণসীতে শাস্ত্র (সংস্কৃত) শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা নরনারায়ন খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। বিচার শেষে শ্রীমন্তশংকরদেব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বিবেচিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন এবং রাজোচিত সম্মানের সহিত রাজসভা হইতে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

সমালোচকদের মতে 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' ও 'রুক্মিণীহরণ' কাব্য দুইখানি শ্রীমন্তশংকরদেবের যৌবনের রচনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান কাব্যে বৈষ্ণব কৃপার মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। রুক্মিণীহরণ কাব্যের মূল কাহিনী হরিবংশের অন্তর্গত। কাব্যিক সৌন্দর্য্য, চরিত্র চিত্রণ এবং আঙ্গিকের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্যহেতু এই দু'খানি কাব্য অসমীয়া সাধারণ পাঠকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

ভাগবত পুরাণের বিবিধস্কন্ধ এবং উত্তরকাণ্ড রামায়ণ শ্রীশংকরদেবের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ গ্রন্থ। অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধে শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রভাব দৃষ্ট হলেও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ অসমের বৈষ্ণব ধর্মের বা একশরণ নাম ধর্মের একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবেই সমাদৃত।

ভারতের ভক্তি আন্দোলনে, সঙ্গীত বা কীর্তন বা ভজনের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার, ধর্মশিক্ষা এবং ধর্মজীবনে উৎসাহ বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ এই কীর্তন বা ভজন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সব ভারতীয়দের অতি-পরিচিত। শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত কীর্তন পুথি, 'কীর্তন-ঘোষা' নামে পরিচিত এবং অসমীয়া হিন্দুদের নিত্য ব্যবহার্য্য একখানা উপাসনা গ্রন্থ। প্রখ্যাত অসমীয়া কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মতে, "ভাষার সৌন্দর্য্য, ছন্দের ঝংকার, সুরের লালিত্য, ভাবের মাধুর্য্য, ভক্তির দৃঢ়তা ইত্যাদির সমন্বয়ে শংকরদেবের কীর্তন রচিত।"[৬] কীর্তনঘোষার প্রতিটি কীর্তন এক একটি খণ্ড কবিতা। প্রতিটি কীর্তনের নির্দিষ্ট একটি খণ্ড বাক্য বা ঘোষা পুনঃ পুনঃ সুর দিয়ে আবৃত্তি করে এবং বাকী পদ সমূহ ভক্তি সহকারে সুর তালের মিল রেখে সমবেত সঙ্গীত (কীর্তন) হিসেবে গাওয়া হয়। ব্রহ্মপুরাণ অবলম্বনে উরেষা বর্মন, পদ্মপুরাণ

অবলম্বনে নাম-অপরাধ ইত্যাদি দুই-তিনটি খণ্ডের বাহিরে, কীর্তন ঘোষার প্রতিটি কীর্তনের বিষয় বস্তুই ভাগবত পুরাণ থেকে গৃহীত।

ভজন বা ভক্তি-গীত কবিতা সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভক্তের ভগবত প্রীতি তথা গভীর হৃদয়ানুভূতি এবং উচ্ছ্বাস-পূর্ণ আবেগের পরম নিদর্শন এই গীতি কবিতা। শ্রীমন্তশংকরদেব বিরচিত ভারতীয় রাগরাগিণী নির্ভর একগুচ্ছ ভক্তি-গীতির নাম 'বরগীত'। এই শাস্ত্রীয় গীত-কবিতা প্রধানত দুই শ্রেণীর—বরগীত এবং ভটিমা বা প্রশস্তি। ভারতীয় গীতি কবিতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। অসমে প্রাকশংকরী যুগেও পীতাম্বর কবি, দুর্গাবর প্রমুখ ভারতীয় মার্গ সংঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিনী ব্যবহার করে সঙ্গীত রচনা করেছেন শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত বর গীত যদিও সেই প্রাচীন ধারার ফলশ্রুতি তবু ভাষার সৌন্দর্য্যেও বিষয়বস্তুর পবিত্রতায় ও নতুনত্বে অসমীয়া গীতকবিতার ইতিহাসে এক আবেগময় বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে। অসমীয়া ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ৺দেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া বরগীত সমূহকে আখ্যা দিয়েছেন, "Holy Songs", প্রখ্যাত অসমীয়া চিন্তাবিদ লেখক কালিরাম মেধির মতে বরগীত সমূহ "Song Celestial".

ডঃ মহেশ্বর নেওগ তার বিখ্যাত "শ্রীশ্রীশংকরদেব" গ্রন্থে বরগীতের বৈষিষ্ট্য-সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বরগীতের ভাষা "ব্রজবুলি"। "It is a kind of maithili mixed with Bengalee in Bengal and with Assamase in Assam with some earlier Apabransa and contemporary western Hindi (Brajabhasa)—Dr. S.K. Chatterjee.[৭] সর্বভারতীয় বৈষ্ণবকবিদের ন্যায় মৈথিলীউদ্ভুত ব্রজবুলির ব্যবহার সম্ভবত একদিকে সর্বভারতীয় চৈতণ্যের সাথে একাত্মতার উপলব্ধি এবং অপরদিকে "একশরণ নাম ধর্ম" অসমীয়া জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলাই ছিল শ্রীমন্তশংকরদেবের প্রধান উদ্দেশ্য। বরগীতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তার বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য যেমন বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি ধর্মের প্রাধান্য, তার আবেগ প্রবন সুর, উপাসনা বা প্রার্থনা সঙ্গীতের রূপরেখায় রচনাশৈলী এবং সর্বোপরি ভাবের পবিত্রতা। বরগীত সমুহের অন্তর্গত হিসেবে বিবেচিত অপর গীতসমূহ 'ভটিমা'। অসমীয়া ভটিমা শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রশস্তি, ভাটগণ কর্তৃক গীত বিশেষ একশ্রেণীর গীত। শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত ভটিমা প্রধানত তিন শ্রেণীর, নাটকীয় ভটিমা, দেব ভটিমা ও

রাজ ভটিমা। নাট ভটিমা নাটকের অঙ্গ। অপর দুইটি দেবতা ও রাজার প্রশস্তি। ছন্দ ও শব্দ সংযোজনের গাম্ভীর্য্য, অনুপ্রাসের প্রাধান্য ভটিমা সমূহের বিশিষ্ট লক্ষণ।

শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সঙ্গীত কলার সঠিক অনুধাবন তথা মূল্যায়নের জন্য তাঁর রচিত রাগপ্রধান এই শাস্ত্রীয় 'বরগীত' সমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রয়োজন।

বরগীতের প্রথম বৈশিষ্ট্য তার ভাষা। শ্রীশংকরদেবের নাটকের ন্যায় বরগীতের ভাষাও ব্রজবুলী। সম্ভবত সকল ভারতবাসীর 'একশরণ নামধর্ম' বোধগম্য করার অভিপ্রায়েই সেই সময় গীত সমূহে বহুল প্রচারিত এই ভাষা তিনি ব্যবহার করেছিলেন। বরগীতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিষয় বস্তুর গাম্ভীর্য্য। এই সঙ্গীতে ভারতের সনাতন ভাবধারার আধ্যাত্মিক ফসল বেদান্তদর্শনের সারমর্ম শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিধৃত ভক্তি ধর্ম সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহন বাল্য লীলার পশ্চাতে তার দিব্য জীবনের যে আধ্যাত্মিকবাণী ওতপ্রোতভাবে জড়িত বরগীত সমূহে তারই সুমধুর ধ্বনি সঙ্গীত মাধ্যমে উদ্ভাসিত। বরগীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই সঙ্গীতের সুর। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংমিশ্রণে তৈরী বরগীতের ধ্রুপদী সুর ভক্তকে ভক্তি রস প্রবণ করে ঈশ্বরের আশ্রয়মুখী হতে আহ্বান জানায়।

বরগীতের চতুর্থ এবং শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তার "সীমাবদ্ধ পবিত্রতা"। আধুনিক কালের রবীন্দ্র সঙ্গীতের ন্যায় শ্রীমন্তশংকরদেব ও শ্রীকণ্ঠ মাধবদেব বরগীতের সুর সংযোজন করে নির্দ্দিষ্ট করে গিয়েছেন। শ্রীশংকরমাধব বিরচিত সত্রসমূহে বা ঘরে ঘরে সাঁচি-পাতায় লিপিবদ্ধ বিশেষ গীতসমূহ বরগীত।[৮] একই তালরাগ এবং ভাব-ভাষায় রচিত অন্য গীত রচয়িতাদের এমনকি শ্রীমন্তশংকরদেবের স্বরচিত নাটক সমূহে প্রায় এক ছন্দোবদ্ধ গীত সমূহও বরগীত হিসেবে গণ্য করা হয় না। অর্থাৎ সঙ্গীত শাস্ত্রের কয়েকটি ধরাবাধা নিয়ম মেনে গীতরচিত হলেই বরগীত হবে না। বরগীত সাংসারিক জগতের প্রেমকাহিনী মুক্ত আধ্যাত্মিকভাবের উপাসনা সংগীত—এই কথা মনে রেখে কয়েকটি বরগীত অধ্যয়ন করলে আমরা অনেকটা বুঝতে পারি, যদিও সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য শ্রবণ ও মনন প্রয়োজন। যেমন মায়াবাদ—সংসার অনিত্য, অতএব হে হৃষীকেশ তুমিই আমার আশ্রয়।

গীত ঃ রাগ-কেদার

ধ্রং—পায়েপরি হরি করহো কাতরি প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয় বিষধর বিষে জরজর জীবন নাষহে মোর ॥

॥ পদ ॥

অথির ধন জন জীবন যৌবন
অথির এহু সংসার।
পুত্র পরিবার সবহি অসার
করবো কাহেরি সার ॥
কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল
থির নোহে তিল এক।
নাহি ভয়ো ভব ভোগে হরিহরি
পরম পদ পরতেক ॥
কহতু শঙ্কর এভব সাগর
পার করু হৃষীকেশ।
তুহো গতি মতি দেহু শ্রীপতি
তত্ত্ব পন্থ উপদেশ ॥

(প্রথমবার তীর্থ যাত্রার সময় (১৪৮১—৯৩ খৃঃ) বদরিকাশ্রমে উদ্ধবকে দেখে শ্রীমন্তশংকরদেব এই গীতটি গেয়েছিলেন।)

সারাংশ—ধ্রুং—হে প্রভু, বিষয়বাসনার মোহে আমার জীবন জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, গতিকে তোমার চরণে প্রার্থনা করি তুমি আমার জীবন রক্ষা কর।

পদ ঃ— ধন, জন, জীবন, যৌবন এমনকি এই সংসারই মূল্যহীণ, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন সবই অসার। পদ্মফুলের জলও স্থির থাকে কিন্তু আমার মন ও আমার দেহ একতিলও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। যদি হরি নাম অন্তরে গ্রহণ করা হয় তবে এই সংসারের মায়া ও মোহের কোন ভয় থাকে না—সব কিছু হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই শংকর বলিতেছেন, হে হৃষীকেশ ঈশ্বর, তুমি আমাকে সংসারের মায়া হইতে উদ্ধার কর। তোমার চরণকেই আশ্রয় করিয়া যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি তাহার পথ তুমি প্রদর্শন কর।

আবার যেমন, জরামরণ জর্জরিত জীবন সায়াহ্নে হে কমলাপতি তুমিই আমার গতি।

রাগ ঃ—ধনশ্রী (তাল—পরি)

ধ্রুং—শারঙ্গপাণি পাহি, পামরমতি হামি।

নিরয় নিবায় আবরি নাহি হেবুয়ো, বিণে তধু চরণস্বামী ॥

॥ **পদ** ॥

জরা মরণ মেরি নিকটহি আয়া
কায়া পরত কেতি বেরি।
করতহু পাপ সমাপল আয়ি
ভাবি চরণ মা তেরি ॥
দেখহু ক্ষীণ দিনে দিনে দেহা
আধি ব্যাধি বিঘাত।
অন্তকালে গতি মেরি কমলাপতি
শংকর করু প্রণিপাত ॥

সারাংশ—ধ্রুং—হে ত্রাণকর্তা কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত পাপমতি, অন্যায় কর্ম করিতে কোন বাধা পাই নাই, কিন্তু আমি এখন তোমার শ্রীচরণ চিন্তা হইতে কখনও বঞ্চিত হইব না।

পদ—জরা মৃত্যু আসিয়া সমুপস্থিত। দেহ অবসানের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করিব। এই জীবনে কতই না পাপ করিলাম—এখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত কিন্তু তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করা হইল না। দিন দিন শরীর ক্রমশঃ নানা ব্যাধিতে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। হে কৃষ্ণ, শংকর তোমাকে প্রণিপাত করিতেছে যেন তোমার কৃপা লাভ করিতে পারে।

আরো যেমন, হে মন রাম নাম ভজন করে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ কর, একমাত্র রাম নামই মুক্তি দিতে পারে।

গীত ঃ রাগ-ধনশ্রী (তালপরি)

ধ্রুং—মন মেরি রামচরণ হি লাগু।
ওই দেখ না অন্তক আগু ॥

॥ পদ ॥

মন আয়ুক্ষণে ক্ষণে টুটে ।
দেখ প্রাণ কোন দিন ছুটে ॥
মন কাল অজগরে গিলে
জান তিলেকে মরণ মিলে ॥
মন নিশ্চয় পতন কায়া ।
তাই রামভজ তেজি মায়া ॥
রে মন ইসব বিষয় ধান্ধা ।
কেনে দেখিনে দেখস আন্ধা ॥
মন সুখে পায় কৈচে নিন্দ ।
তই চেতিয়া চিন্ত গোবিন্দ ॥
মন জানিয়া শংকরে কহে ।
দেখ রাম বিনে গতি নহে ॥

(এই বরগীতটি শ্রীমন্তশংকরদেবের প্রথম তীর্থযাত্রাকালে সর্বপ্রথম গীতরূপে স্বীকৃত।)

সারাংশ—ধ্রুং—আমার মন রাম-চরণ জন্য আকুল হইয়াছে কারণ সম্মুখে আমার শেষ সময় আগত।

পদ—আমার আয়ু ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। প্রাণবায়ু কখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে বলিতে পারি না। কাল অজগর আমার মনপ্রাণ গ্রাস করিতেছে, যে কোন সময় আমার মৃত্যু হইতে পারে। অতএব হে মন, মায়াকে বর্জন করিয়া রাম-নাম ভজনা কর। মন সর্বদাই বিষয় বাসনার কথাই চিন্তা করিয়া থাকে, অন্ধকার দেখিয়াও অনুভব করিতে পারে না। বিষয় বাসনার চিন্তা করিয়াই বৈষয়িক সুখ লাভ করে। তাই গোবিন্দকে চিন্তা করিয়া আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ কর। মানুষের এই অবস্থার কথা লক্ষ্য রাখিয়া শংকর বলিতেছেন যে, রামনাম চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই এবং রামই সংসারের মায়া-মমতা হইতে মানুষকে সতিকারের মুক্তি দিতে পারে।[৯]

অবশেষে, সর্বশক্তিমান নারায়ণের পাদপদ্মে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

রাগ—ধনশ্রী (তাল-পরি)

ধ্রং—নারায়ণ কাহে ভকতি করো তেরা।
মেরি পামরু মণ মাধব ঘনাঘন
যাতুক মন নাছোড়া ॥

॥ পদ ॥

যত জীব জঙ্গম কীট পত পতঙ্গম
অগ জগ নগ তেরি কায়া।
সরকহু মারি পূরত ওহি উদর
নাহি করতু ভূত দায়া ॥
ঈশ স্বরূপে ধুরি সব ঘটে বৈটহ
যৈচন গগণ বিয়াপি।
নিন্দা, বাদ পৈশুণ্য হিংসা হরি
তেওি করোহে৷ হামুপাপি ॥
কাকু শংকর কয় কর হু করুণা নাথ
যো নো ছারোহু রাম বাণী।
সব অপরাধক বাধক তুরা নাম
তাহে শরণ লেহু জানি ॥

সারাংশ—হে নারায়ণ আমার এই পাপী মন পাপে পরিপূর্ণ—আমি তোমাকে কেমন করিয়া ভক্তি করিব।

পদ—যত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ বিদ্যমান সবই তোমার রূপ। দয়া মায়া ব্যতীত সকলকে মৃতবৎ রাখা হয়। সমগ্র আকাশ যেমন সর্বত্র বিদ্যমান তেমনি সকল জীবে হরিও বিদ্যমান। কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রতি কুৎসা, বিবাদ এবং হিংসা করিয়া পরোক্ষভাবে তোমাকেই নিন্দা করিয়া থাকি। এই সমস্ত কারণে আমরা পাপী। তাই শ্রীশংকর বলিতেছে রাম নাম যেন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া কৃপা করে। হে নারায়ণ, আমাদের সমস্ত দোষ মার্জনা করার জন্য তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি।

বরগীত রাগরাগিণী নির্ভর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। শুধু হারমোনিয়াম বা তানপুরায় শুদ্ধ স্থর-তাল-লয় তোলা দুঃসাধ্য। তাই খোল, করতাল সহযোগে শুদ্ধ স্থর-তাল তুলে গাওয়া হয়। চরিতকারদের মতে কমলা গায়ণ নামে একজন ভক্ত-গায়ক শ্রীমন্ত শংকরদেবের হস্ত লিখিত বরগীতগুলো মুখস্ত করার জন্য নিয়ে যায় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে সেগুলো আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

কথিত আছে গীতিকার শ্রীমন্তশংকরদেব মোট ২৪০, দুইশত চল্লিশটি বরগীত রচনা করেছিলেন (কথা গুরুচরিত পৃঃ ২৭১) কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৩৪টি গীত বর্তমানে পাওয়া যায়। তার নাটক সমূহে আরও ৪৮টি গীত আছে এবং অনেক অসমীয়া কলাশিল্পী তার মধ্যে কয়েকটিকে বরগীত হিসেবে গণ্য করায় উৎসাহী। শ্রীমন্তশংকর-দেবের গীতসমূহে ২৮টি সর্বভারতীয় রাগের উল্লেখ আছে, যদিও অধিকাংশ রাগেই তার নিজস্ব সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীত কলা বিশারদ শ্রীমন্ত শংকরদেব রচিত ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের রাগ রাগিণী নির্ভর এই ভক্তিমূলক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসমূহ অবশ্যই এক নতুন শ্রেণীর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী রাখে।

শ্রীমন্তশংকরদেব শুধু একজন কবি, গীতিকার, চিত্রকর, এবং সুরকারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নাট্যকারও। নাট্যরচনা এবং নাটকের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার তার সৃজনী প্রতিভার এক বিস্ময়কর মৌলিক কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক বিচারেও তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় নাট্য সাহিত্যের জনক। সর্বোপরি "শংকরদেব ছিলেন একজন বিদগ্ধ ভাষাবিদ"। তার স্বরচিত নাটকে ব্যবহৃত গদ্য অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। "সুন্দর শব্দ এবং সরল বাক্যের মাধ্যমে মায়াজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কথাশিল্পী"[১০]

গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে সংস্কৃত নাটকের পরিচয় এবং সুদীর্ঘ বার বৎসর তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, তিনি সর্বপ্রথল "চিহ্ন" (বা চিহ্নমাত্রা") নামে একখানা নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেছিলেন, একথা শংকর চরিত্র ও কথা গুরুচরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। রামচরণ ঠাকুর রচিত চরিত গ্রন্থ মতে শ্রীমন্তশংকরদেব দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণের পর 'জন্ম-যাত্রা' নামে আরও একখানা নাটক লিখে অভিনয় করিরেছিলেন। দুঃখের বিষয় এ দুখানা নাটকের একখানাও পাওয়া যায় না। একাধিক চরিতকার ও জীবনীকারদের মতে "চিহ্ন-যাত্রা" বা "জন্ম-যাত্রা" নাটক দুখানা অভিনীত হলেও শ্রীমন্তশংকরদেব রচনা করেননি। সে যাই হোক, এই চিহ্নযাত্রা অসমীয়া সঙ্গীত ও নাট্যকলার এক নতুন অধ্যায়ই শুধু নয়, ভারতীয় আধুনিক নাট্য সাহিত্যের এক নব যুগের শুভারম্ভ। যদিও শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত নাটক ছিল তার ভক্তিধর্ম সাধারণে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টার একটি প্রধান অঙ্গ, ঐতিহাসিক বিচারে ইতিপূর্বে কোন নাট্যকার নাট্য সাহিত্যে আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করেননি। তদুপরি শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত নাটকে

ব্যবহৃত গদ্যই প্রকৃতপক্ষে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন যদিও আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্য থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক "ছন্দোময় কাব্যিক ভাষা।"

শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত নাটকের সংখ্যা ছয়। পত্নীপ্রসাদ, কালিয়দমন, কেলিগোপাল এবং পারিজাত হরণের কাহিনী ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। রুক্মিণীহরণ হরিবংশ অবলম্বনে রচিত এবং রামবিজয় নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণের বালকাণ্ডের একটি অংশ মাত্র। পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হলেও শ্রীমন্তশংকরদেব তার সব কয়টি নাটকেই নিজস্ব কৌশলে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। যেমন "রামবিজয়" নাটকে প্রধান ঘটনা প্রবাহ থেকে বশিষ্টকে প্রায় বাদ এবং রাম-লক্ষণের মিথিলা আগমনের সময় সীতার স্বয়ম্বর ইত্যাদি ঘটনার উপস্থাপনা।

প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ মহেশ্বর নেওগ শ্রীশংকরদেব রচিত নাটকের অঙ্গ বিভাগ করেছেন প্রধানত চারটি প্রকাশ মাধ্যমে, গীত, শ্লোক, ভটিমা এবং কথা।[১১] শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকে দুই রকম গীত আছে। রাগপ্রধান এবং পয়ার। রাগপ্রধান সঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের মনোভাব, অনুভূতি এবং চাল-চলন প্রকাশ করা হয়েছে আর পয়ার সাধারণত করুণ রসাত্মক বিলাপ-বিবরণ বর্ণনাত্মক।

শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকে ব্যবহৃত শ্লোকসমূহ সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নান্দীপাঠ, কাহিনী বর্ণন এবং নাটকের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত পরিচায়ক শ্লোক। তৃতীয় অঙ্গ মাধ্যম, 'ভটিমা'। তাঁর নাটকে তিন শ্রেণীর ভটিমা লক্ষিত হয়। প্রথম নাটকের নায়কের স্তুতিবাচক ভটিমা, দ্বিতীয় মঙ্গল ভাটিমা যা সর্বজনের আধ্যাত্মিক কুশল বা মঙ্গল কামনা এবং তৃতীয় ভরত বাক্য অর্থাৎ ভাব, রাগ এবং তালের সহযোগে সমাপ্তিশ্লোক পাঠ। নাটকসমূহে বিশেষত সঙ্গীতাংশে স্বাভাবিকভাবেই নৃত্য সংযোজিত এবং বিভিন্নভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশন একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যালঙ্কার বা নাট্য কৌশল।

অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ডঃ মহেশ্বর নেওগ প্রমুখ স্বনামধন্য অসমীয়া পণ্ডিত ও সাহিত্য সমালোচকগণ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকের বিশদ সাহিত্যিক মূল্যায়ন করেছেন। সে আলোচনার অবকাশ আমাদের এই গ্রন্থে নেই। কিন্তু অসমীয়া তথা ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট আলোচনা এবং ঐতিহাসিক মূল্যায়ন শ্রীমন্তশংকরদেবের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা অনুধাবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার ও

প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীশংকরদেবের নাটকসমূহ কেবল অসমের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসেই নয় ভারতের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসেও এক অভিনব সম্পদ। কাব্য-গীত-পদ প্রভৃতির সাহায্যে ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কিন্তু নাটকের সাহায্যে ধর্মপ্রচার, নিঃসন্দেহে শ্রীশংকরদেবের এক অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। সন তারিখের হিসেবে এ বিষয় তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারেও আধুনিক প্রচারধর্মী নাটকের তিনি জনক।

অংকীয়া নাটকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট সংক্ষেপে নিম্নরূপ। প্রথম বৈশিষ্ট নাটকের সূত্রধর। সূত্রধর, "নাটকের চরিত্র এবং দর্শকের মধ্যস্থ যোগসূত্র। তিনি চরিত্রের ব্যবহার ও কার্যাবলী দর্শকের বোধগম্য হতে সাহায্য করেন। উপযুক্ত পটভূমি ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য আধুনিক নাট্যকার নাটকের ভিতর যে নির্দেশ ও ইঙ্গিতের পরিচয় দেন অংকীয়া নাটকে তা সূত্রধর দ্বারাই সম্পন্ন হয়।" (অসমীয়া নাট্যসাহিত্য—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা)। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধরের সঙ্গে আংশিক মিল থাকলেও অংকীয়া নাটকের সূত্রধর শ্রীমন্তশংকরদেবের নিজস্ব সৃষ্টি। প্রচলিত "ওজাপালি" (গীত-পদ-বাদ্য-সংযোগে পৌরাণিক বা প্রচলিত আখ্যান পরিবেশন) অনুষ্ঠানের আদর্শে রচিত তার নাটকে সূত্রধর ওজাপালির ওজার ন্যায় নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধর নান্দীপাঠ ও প্রস্তাবনার পরে নাটকীয় চরিত্রদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর যেমন মঞ্চ ত্যাগ করেন অংকীয়া নাটকের সূত্রধর তা করেন না। তিনি আরম্ভ থেকে নাটকের সমাপ্তি পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনয় পরিচালনা করেন। অংকীয়া নাটকে অবশ্য কোন বিদুষক চরিত্র নাই যা সংস্কৃত নাটকে একটি অপরিহার্য্য চরিত্র। নাট্যকলা বিশারদদের মতে অংকীয়া নাটকে সূত্রধর যেমন নাটকটি দর্শকদের সহজে বোধগম্য হতে সাহায্য করেন তেমনি নাটকীয় কৌতূহল (Dramatic suspense) অংশত ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু অংকীয়া নাটক প্রচারধর্মী। ভক্তি ধর্ম প্রচারই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। কাহিনী ও তার পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শকদের জানা। ঘটনা বিন্যাস ও তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভক্তি-রসের সূক্ষ্ম মাধুর্য্য ও গভীরতা দর্শকদের আপ্লুত করে।

অংকীয়া নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট গীত, শ্লোক ও পয়ারের ব্যবহার। এই নাটকের বিষয়বস্তু বিকশিত হয়ে উঠে গীতের মাধ্যমে। তাই গীত অংকীয়া নাটকের প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাটকের প্রতিটি ঘটনা প্রথমে শ্লোকের

সাহায্যে উপস্থাপিত হওয়ার পর গীতের সাহায্যে তা বিস্তার ও ব্যাখ্যা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অংকীয়া নাটকের গীত-পদ নাটকীয় চরিত্রের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম।

শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকের তৃতীয় বৈশিষ্ট ভাষার ব্যবহার। মহাপুরুষের নাটকের ভাষা ব্রজবুলি। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি তার পদাবলীতে যে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে বাঙালী, অসমীয়া, উড়িয়া কবিগণ নিজ নিজ ভাষার শব্দ যোগ করে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করেছেন। ব্রজবুলি কারণ এই ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামের শিশুলীলা প্রকাশিত ও পরিবেশিত। সম্ভবত শ্রীমন্তশংকরদেব চেয়েছিলেন তার সাহিত্যসম্ভার যেন শুধু অসমে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রসারিত হয়ে এক বৃহত্তর সংহতি স্থাপন করতে পারে। এছাড়া তাঁর নাটকে ব্যবহৃত গদ্য অসমীয়া এবং অনেক ভাষা বিজ্ঞানীর মতে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রয়াসই শুধু নয়, সাহিত্যে আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষা ব্যবহারেরও প্রথম নিদর্শন।

অংকীয়া নাটকের চতুর্থ বৈশিষ্ট নাটকে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার। সম্ভবত মূল আখ্যানের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্যই সংস্কৃত শ্লোকের বাবহার অপরিহার্য্য ছিল। অসমীয়া নাটকে প্রথমে নাটকের বিষয়বস্তু সংস্কৃত শ্লোকে উপস্থাপনের পর গীত এবং কথার সাহায্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়।

অংকীয়া নাটকের বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে এই নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য ও পার্থক্য স্মরণযোগ্য। কারণ সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে অংকীয়া নাটকের সাদৃশ্য থাকলেও দুই শ্রেণীর নাটকের আঙ্গিক ও গঠন শৈলীর পার্থক্য অনেক। যেমন অংকীয়া নাটক সংস্কৃত নাটকের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ নাটক হলেও সংস্কৃত নাটকে অংক থাকে পাঁচ থেকে দশটি কিন্তু অংকীয়া নাটকে অংক থাকে মাত্র একটি। এবং সংস্কৃত নাটকের অংক গর্ভাংক বা দৃশ্যে বিভক্ত কিন্তু অংকীয়া নাটকে অংক দৃশ্যের বিভাজন নাই। আবার সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তুর ন্যায় অংকীয়া নাটকের বিষয়বস্তু মহাকাব্য অথবা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে গৃহীত হলেও সংস্কৃত নাটকের নায়ক মানুষ, রাজা অথবা রাজর্ষি, অংকীয়া নাটকের নায়ক স্বয়ং ভগবানের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীরাম। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নয় বিধ রসের উল্লেখ আছে। নাটকে বীররস ও শৃঙ্গাররসের সাহায্যে অন্য বাকী সব রস পরিবেশিত হয়। অংকীয়া নাটকে সংস্কৃত নয় বিধ রসের আশ্রয়ে সামাগ্রিকভাবে সৃষ্ট

ভক্তিরসের প্রাধান্য। এবং সংস্কৃত নাটকের সমাপ্তি সর্বদাই মিলনাত্মক (Comedy), কোন বিয়োগাত্মক সমাপ্তি (Tragedy) নাই। অংকীয়া নাটকে মিলনাত্মক কিংবা বিয়োগাত্মক দুই প্রকার সমাপ্তিই হতে পারে। তাছাড়া সাধারণভাবে সংস্কৃত নাটক ঐহিক ভাবাপন্ন, বস্তুতান্ত্রিক কিন্তু অংকীয়া নাটক পারত্রিক ভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকতা তার মূল উৎস।

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে কথিতভাষা হিসেবে সংস্কৃতের ব্যবহার খৃঃ পূঃ তিনশত শতকের থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে উত্তর ভারতে সাহিত্যের ভাষা হয় প্রাকৃত ও মৈথিলী। মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর (খৃঃ ১৩৪৩-১৪৩৮) মৈথিলী ভাষায় তার পদাবলী রচনা করেন। তাঁর "গোরক্ষ বিজয়" নাটক এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত মধ্যযুগের ভারতীয় নাটকের মধ্যে প্রাচীনতম। এই নাটকের সংলাপ সংস্কৃত ও গীত মৈথিলী ভাষায় রচিত। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মৈথিলী নাট্যকার উমাপতি উপাধ্যায় সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার। তার পারিজাতহরণ নাটকে সংস্কৃত,প্রাকৃত ও মৈথিলী ভাষা ব্যবহৃত। শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার নাই। সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া আর সব ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। মধ্যযুগীয় ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্যে উত্তর ভারতের "রাসধারী" ও "রামলীলা", পশ্চিম ভারতের "ললিতা", দক্ষিণ ভারতের "কথাকলি" গুজরাটের "ভাবই" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য সমালোচকদের মতে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবই সর্বপ্রথম সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ব্রজবুলি ভাষায় তার অংকীয়া নাটক রচনা করেন।

শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত নাটকের সংখ্যা ছয়। তার প্রথম রচনা 'পত্নীপ্রসাদ।' পরবর্তীকালে ক্রমে তিনি 'কালীয়দমন', 'কেলিগোপাল', 'রুক্মিণীহরণ', 'পারিজাত হরণ' এবং শেষ বয়সে 'রামবিজয়' নাটক রচনা করেন। রামচরন ঠাকুর প্রমুখ গুরুচরিতকারদের লেখনীতে উল্লেখিত তার প্রথম জীবনে রচিত 'চিহ্নযাত্রা' এবং পরবর্তীকালে "জন্ম-যাত্রা" নাটক দুখানার কোন লিখিত কপি আজও পাওয়া যায়নি।

শ্রীমন্তশংকরদেব নাটক রচনা করেছিলেন প্রধানত তাঁর একশরণ নাম ধর্ম-প্রচারের জন্য। ভক্তিই ভগবত প্রেমের সার কথা। এবং সেজন্যই হয়তো একমাত্র "রামবিজয়" নাটকটি ছাড়া বাকী সব নাটকের কাহিনীর মুল উৎস ভাগবতপুরাণ, বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের লীলাপ্রকাশক ভাগবতের দশম স্কন্ধ।

যদিও কাহিনীর বিকাশ ও নাট্যকলার সুনিপুণ বিন্যাসের জন্য ভাগবতের সমধর্মী গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী স্থানে স্থানে সংমিশ্রণ করা হয়েছে। প্রথম নাটক "পত্নীপ্রসাদ" ভাগবতের দশম স্কন্ধের শিশু কৃষ্ণের গোপালক জীবনের কাহিনীয় উপর প্রতিষ্ঠিত। যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ভক্তি বিরোধী বৈদিক ব্রাহ্মণদের ভক্তিপরায়ণা পত্নী এবং গোপীদের বিরোধ ভিত্তি করে এই নাটকের কাহিনী ভাগ রচিত। ভাগবতের ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায়ের বিবরণ পরবর্তী নাটক "কালীয়দমনের" ভিত্তি। এই নাটকে তৃষ্ণাতুর গোপালকগণ কালীয় হ্রদের জলপান করে বিষক্রিয়ায় অচৈতন্য হয়ে পড়া থেকে শ্রীকৃষ্ণের বনাগ্নি পানের কাহিনী পর্য্যন্ত বিধৃত। "রাস পঞ্চাধ্যায়"-এর গোপীগণের রাসনৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদেয় পুর্ণমিলন "কেলিগোপাল" নাটকের মূল উৎস আখ্যান। "রুক্মিণীহরণ" ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৫২-৫৪ অধ্যায়ে বর্ণিত ভীষ্মক দুহীতা রুক্মিণীর স্বয়ম্ভর সভা থেকে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ, কৃষ্ণ শিশুপালের যুদ্ধ এবং শেষে দ্বারকায় মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর বিবাহের নাট্যরূপ। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণের কাহিনী 'পারিজাত হরণ' নাটকের মূল আখ্যান। "রামবিজয়" মূল নাটকের আখ্যান বাল্মিকী রামায়ণের আদি কাণ্ড। যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম-লক্ষণের অন্বেষণে বিশ্বামিত্রমুনির দশরথের রাজসভায় আগমন, রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা রাক্ষস অপসারণ, রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্রের মিথিলা গমন, রাম কর্তৃক হরধনু ভঙ্গ, পত্নীরূপে সীতা লাভ এবং শেষে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অযোধ্যা প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের নাট্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রেও ঐশ্বরিকভাবের আরোপ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি, আঙ্গিক ইত্যাদি নাটকীয় কলা কৌশলের দিক থেকে 'পারিজাতহরণ' শ্রীমন্তশংকরদেবের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। সংক্ষেপে নাটকটির কাহিনী নিম্নরূপ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের রাজা নরকাসুরের অত্যাচার উৎপীড়নে দেবগণ অতিষ্ট এবং মর্ত্যধামের প্রজাগণের জীবন বিপর্যস্ত, দুর্বিসহ। একদিন দেবর্ষি নারদ এই অভিযোগ নিয়ে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তার প্রথমা পত্নী রুক্মিণী একসঙ্গে বসে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা পারিজাত ফুলটি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিয়ে নারদ প্রথম স্বর্গীয় ফুলের মহিমা বর্ণনা করলেন এবং পরে দেবমাতা

অদিতির কুণ্ডল, বরুণের ছত্র, মণি-পর্বত ইত্যাদি নরকের হাত থেকে উদ্ধার করে দেবকুল রক্ষার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। নারদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রও এসেছেন এবং তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে একই অনুরোধ জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ সব শুনে পারিজাত ফুলটি রুক্মিণীর খোপায় পরিয়ে দিলেন এবং দেবকুল রক্ষায় সম্মত হলেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হাতে রুক্মিণীর চুলের খোপায় ফুলটি গুঁজে দিতে দেখে নারদ তৎক্ষণাৎ সত্যভামার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্তে রুক্মিণীর খোপার পারিজাত ফুল পড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন। 'সতিনীর অভ্যুদয়' দেখে সত্যভামা অভিমানে, রাগে, ঈর্ষায় জ্বলে উঠেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর বধ করে পরে স্বর্গ থেকে পারিজাত ফুল এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সত্যভামা সে প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যাওয়ার জন্য জেদ ধরলেন। নরকাসুর বধ করে শ্রীকৃষ্ণ ভগদত্তকে সিংহাসনে বসিয়ে অদিতির কুণ্ডল, বরূণের ছত্র, মণি-পর্বত ইত্যাদি সহ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে যান। নরকাসুর বধে পরম সন্তুষ্ট ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ইন্দ্রের কাছে সত্যভামার জন্য একটি পারিজাত ফুল প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইন্দ্রপত্নী শচী বাধা দেওয়ায় ইন্দ্র পারিজাত ফুল দিতে অস্বীকার করেন। তখন ক্ষুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ একটি সমূল পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে নিয়ে আসায় ইন্দ্র-উপেন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান মেনে নিয়ে সানন্দে পারিজাত বৃক্ষটি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। দ্বারকায় ফিরে এসে অন্য কোন মহিলা ফুল চুরি করে নিতে পারে আশঙ্কা করে সত্যভামা নিজ গৃহদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের নিজ হস্তে পারিজাত বৃক্ষটি রোপণ করান।

নরকাসুর বধ এবং পারিজাতহরণের মূল কাহিনী ভাগবত ছাড়াও বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশে পাওয়া যায়। ঘটনাক্রমের সামান্য তারতম্য থাকা সত্বেও ভক্তি-ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে কোন একটি কাহিনী অনুসরণ করেই নাটকটি রচিত হতে পারত। কিন্তু নাটকের ঘটনার বিন্যাসে শ্রীমন্তশংকরদেব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে নরকাসুর বধ ও পারিজাতহরণের কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। পরস্পরের মধ্যে কোন আঙ্গিক সম্পর্ক নাই, এমনকি রসোপলব্ধির জন্য একত্রিত করারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু শ্রীমন্তশংকরদেবের উদ্দেশ্যই ছিল শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মহানুভবতা, ভক্ত-বাৎসল্যতা, দয়া, প্রেম ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল ইত্যাদি অপহরণ করে

স্বর্গের সিংহানন অধিকার করা নিজ পুত্র নরকাসুসকে বধ করে দেবরাজের এতবড় উপকার করার পরেও সত্যভামার জন্য সামান্য একটি পারিজাত ফুল দিতে অস্বীকার করা এবং যুদ্ধে হেরে অনুতপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের সব দোষ ক্ষমা করা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই মহৎ গুণ এবং ভক্ত-বাৎসল্যের হৃদয়গ্রাহী ভাব দর্শকের কাছে উপস্থাপন করাই ছিল নিঃসন্দেহে এই কাহিনী দুটির একত্রিত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তদুপরি কাহিনী বিন্যাসে ভাগবত এবং হরিবংশ অনুসরণ করা ছাড়াও প্রয়োজনীয় নাট্যকৌশল প্রয়োগ নাট্যকাবের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। যেমন হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত আনতে স্বর্গে ঘাওয়ার সময় সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে। নাটকে সত্যভামা চরিত্র যে রকম জেদী, অভিমানী ও সতিনী-ঈর্ষাপরায়ণারূপে অঙ্কিত হয়েছে এবং তাকে দ্বারকায় না রেখে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেভাবে স্বর্গে পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মুখোমুখী করে নাটকীয় ঘটনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার সহায়করূপে উপস্থাপিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নাট্যকারেয় গভীর মনোস্তাত্বিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কাহিনী বিন্যাস ও ঘটনা ক্রমবিকাশের পর যে দিকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নাটকটির চরিত্র সৃষ্টি। আধুনিক সফল নাটকের ন্যায় পারিজাতহরণের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্টে সমুজ্জল। পারস্পরিক বৈপরিত্য ও সাদৃশ্যে উপস্থিত চরিত্রগুলো আশাতীতভাবে জীবন্ত। নাটকে সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ শচী ও ইন্দ্র পরস্পর সহধর্মীতার ভিত্তিতে অঙ্কিত। অপরদিকে রুক্মিনী ও সত্যভামা পারস্পরিক বৈপরীত্যের ভিত্তিতে চিত্রিত।

চরিত্র সৃষ্টির বাহ্যিক কলাকৌশল এবং উপস্থাপন ছাড়াও নাটকের চরিত্রকে স্বাভাবিক ও সজীব রূপদানের জন্য আধুনিক নাট্যকারদের অনুমোদিত শক্তিশালী ভাষা, সংলাপ, সংঘাত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ব্যবহার শ্রীমন্তশংকরদেবের অবিস্মরণীয় শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। পারিজাতহরণ নাটকে বাহ্যিক সংঘাত সৃষ্টির প্রধান সহায়ক নারদ চরিত্র। সত্যভামার মানসিক অন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণ শ্রীকৃষ্ণকে নারদ কর্তৃক পারিজাত ফুল উপহার এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজ হাতে তা রুক্মিণীর খোপায় পড়িয়ে দেওয়া। নরকাসুর বধের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসে শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত ফুল উপহাব দিয়ে রুক্মিণীকে শুনিয়ে "ওহি দেব দুর্লভ পারিজাত যো নারী পরিধান করে, সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম শোভাগিণী হয়। তাহেক ছাড়ি, স্বামী কথায়

জায়ে নাহি," বলে পরমুহূর্তে সত্যভামার কাছে গিয়ে, "হা হা মায় কি কহব, এসব কথা কহিতে দোষ। হামো দেব দুর্লভ পারিজাত পুষ্প স্বর্গহন্তে আনি কৃষ্ণক হাতে দেলো।……তোমাক কটাক্ষ করিয়ে আপুন হাতে প্রিয়া রুক্মিণীক মাথে পরম সাদরে সে দিব্য পারিজাত পিন্ধালে। আঃ তোমাক জীবন ধিক ধিক। সতিনীর অভ্যুদয় দেখি কি নিমিত্তে প্রাণ ধরহ।"……"সতিনীর অভ্যুদয়" নারী হৃদয়ের এই চিরন্তন আঘাত পারিজাত ফুল কেন্দ্র করে সত্যভামার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এই পারিজাত ফুলই ইন্দ্র উপেন্দ্রের মধ্যে সংঘর্ষের চূড়ান্ত রূপ ও নাটকীয় উৎসক্য সৃষ্টির মুল উৎস এবং সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণ আগে নরকাসুর দমন করে "পাচু পারিজাত আনু" ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সত্যভামা "হে স্বামী, হামার বহুত সতিনী, ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক দেবহ তাহে বুজায়ে নাহি। হামু কদাচিতো তোমারি সঙ্গ নাহি ছাড়ব, বললেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে সঙ্গ নেবে কি নেবে না, দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য পুনরোদ্ধার করে দেওয়ার পর সামান্য একটি পারিজাত ফল নারদের সাথে পাঠাবে কি পাঠাবে না, পারিজাত ফুল পেয়ে সত্যভামা রুক্মিণীকে শুনিয়ে, "হে বিদর্ভ রাজকুমারী, তহো স্বামীকে থানে গোটা এক পারিজাত ফুল পায়ল। দেখু দেখু, যাবত সোহি পারিজাত তরু সমূলে উপারি কৃষ্ণক হাতে নাহি আনল, তাবত ছাড়লো নাহি। হামার সোভাগিক মহিমা পেখো, পেখো।" বলে সগৌরবে অহঙ্কার করার উত্তরে রুক্মিণী কি উত্তর দেয় ইত্যাদি মুহূর্তের জন্য হলেও দর্শকের মনে নাটকীয় উৎসক্য (dıamatic suspense) সৃষ্টি করে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ভক্তি রসে আপ্লুত। অন্যান্য রসসমূহ এই রসের বহিরাবরণ মাত্র। পারিজাতহরণ নাটকে বীর রস, করুণরস ও হাস্যরসের অনেক দৃষ্টান্ত থাকলেও ভক্তিরসই প্রধান। পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ, মনন করে তাঁর পাদপদ্মে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ ও দাস্যভাবে ভক্তিসহকারে সেবার দ্বারা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করাই শ্রীমন্তশংকরদেবের একশরণ ধর্মের মূল কথা। নাট্যকলার মাধ্যমে পারিজাতহরণ নাটকে তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। এবং নিঃসন্দেহে তিনি সফলতা লাভ করেছেন।

বিশুদ্ধ নাট্যকলা-কৌশলের দিক থেকেও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অনুমোদিত নাটকীয় কাহিনীর পঞ্চ অবস্থায় বা পঞ্চ সন্ধির প্রয়োগ পারিজাতহরণ-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট। "সংস্কৃত রূপকে প্রধানভাবে পরিদৃশ্য এই অবস্থা পঞ্চক……

আরম্ভ, প্রযত্ন' প্রাপ্তাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম এবং সন্ধিপঞ্চক হল ক্রমে—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং নির্বহন। নাটকটির যে অংশে কাহিনীর মূল কারণ বীজাকারে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে মুখ, যেখানে বীজ কিঞ্চিত অঙ্কুরিত হয়—তা প্রতিমুখ, যে অংশে নাটকের ঘটনা বিষম অবস্থায় উপনীত হয় তা গর্ভ, যে অংশে নাট্যকাহিনী ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তা বিমর্শ এবং যে অংশে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে বলে নির্বহন।" (অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের জিলিঙনি—ডঃ হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য)। পারিজাতহরণ নাটকে এই সন্ধি পঞ্চক বেশ স্পষ্ট। নাটকের যে অংশে মহর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত ফুল উপহার দিয়েছেন, যেখানে নাটকীয় ঘটনায় মূল কারণ বীজাকারে প্রকাশিত তা নাটকটির আরম্ভ বা মুখ। নরকাসুর বধ করে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত ফুল আনতে যাওয়া পর্য্যন্ত প্রযত্ন বা প্রতিমুখ, ইন্দ্র কর্তৃক পারিজাত ফুল দিতে অস্বীকার করায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জোর করে পারিজাত বৃক্ষ একটি উঠিয়ে আনা এবং তার ফলস্বরূপ ইন্দ্র-উপেন্দ্রের যুদ্ধ-প্রত্যাশা বা গর্ভ, যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের শরণ ও পারিজাত অর্পণ...... নিয়তাপ্তি বা বিমর্শ এবং পরিশেষে সত্যভামার গৃহদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পারিজাত বৃক্ষ রোপণ নাটকীয় কাহিনীর ফলাগম বা নির্বহন।

অংকীয়া নাটকে স্বভাবতই গীতের প্রাধান্য বেশী। তদুপরি চিত্রালংকার, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রায় সব দিক থেকেই পারিজাতহরণের গীতসমূহ আকর্ষণীয়, বিশেষত ভাবের গাম্ভীর্য, শব্দ চয়ন......ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাটকটির প্রথম ভটিমা (প্রশস্তি) একটি অপূর্ব সৃষ্টি। "নাটকীয় ঐক্য (dramatic unity) রক্ষা করে দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক কাহিনীকে একত্রিত করে রচিত এমন কঠোর উদ্দেশ্যধর্মী একখানা নাটকে কোন অংশেই নাটকীয় কার্য্যাবলীর dratic action) সামান্যতম সংহতি বিনষ্ট না করা এবং সেই সঙ্গে নিজ নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখা নিশ্চয়ই কম প্রতিভার কথা নয়। এইখানেই মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব এবং কৃতিত্ব।" (অধ্যাপক শ্রীরামচরণ ঠাকুরিয়া......যুখবন্ধ পারিজাতহরণ নাট......দত্তবরুয়া এণ্ড কোম্পানী, গৌহাটী।)

সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের বিচারে শ্রীমন্তশংকরদেবের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেহেতু "কীর্ত্তনঘোষাই" অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচকদের সর্বাধিক দৃষ্টিলাভ করেছে তাই অনুমান হয় এই গ্রন্থই তার শ্রেষ্ঠ রচনা। জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবশ্য 'কীর্ত্তনঘোষা'র

পরেই ভাগবতের দশম স্কন্ধের স্থান। ভাগবত অসমের সাধারণ ভক্ত মানুষের অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থ।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মানদণ্ডে আবার অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ বর্মন প্রমুখ আধুনিক সমালোচকদের মতে শ্রীমন্তশংকরদেবের "রুক্মিণীহরণ" কাব্য শ্রেষ্ঠ রচনা। বীররস, করুণরস, হাস্যরস ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব গুণাবলীই এই কাব্যে সমাবেশিত। ডঃ মহেশ্বর নেওগ প্রমুখ গবেষক-সমালোচকদের মতে অবশ্য শ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলী প্রচনাধর্মী এবং আদর্শত্মক হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনের পরিচয়,তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী তার রচনায় তেমন প্রতিফলিত হয়নি। অধ্যাপক বর্মণ প্রমুখ সমালোদকদের মতে অবার শ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলীর কাহিনী সমূহ যদিও সর্বভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনী থেকেই গৃহীত, স্থানে স্থানে নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কাহিনী সংযোজন তাঁর সৃষ্টির প্রাতিভার সন্দেহাতীত প্রমাণ। তাঁর রচনায় অসমের গ্রাম্য জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নিবিড় চিত্র পরিস্ফূট, কারণ তাঁর অধিকাংশ উপমাতেই আমরা পাই গাই-গরু, ক্ষেত-খামারের নানা ঘটনার বর্ণনা। সে সময়ে প্রচলিত কবিতার প্রায় সব ছন্দই যেমন, ছবি, দুলাড়ী, পয়ার, ঝুমড়ি, ঝমক, কুসুমমালা ইত্যাদি, তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। তৎসম, তদ্ভব শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার ছাড়াও শ্রীমন্তশংকরদেব ঘরোয়া কথ্য ও যবণিক শব্দের বহুল ব্যরহার তার রচনায় লক্ষণীয় ভাবে করেছেন, যদিও প্রায় তেরহাজার পদ রচনা করা কবির পক্ষে শব্দ যোজনা সর্বদা রসোত্তীর্ণ হয়নি বলে একাধিক আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন।[১২]

শ্রীমন্তশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সম্ভার অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসন্দেহে এক ভাবাদর্শগত ঐক্যের সেতু নির্মাণ করেছে। তাঁর সাহিত্য সংগ্রহের মাধ্যমে তৎকালীন স্থানীয় বিভিন্ন ভাষাবাসীর, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের এই মিলন ছিল এক অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর কীর্তি। এছাড়া সাহিত্যিক মুল্যায়নে তাঁর রচনাবলী অসমীয়া সাহিত্যের মূল ভিত্তি হিসেবে আজও সর্বজন স্বীকৃত।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

সমাজ সংস্কারক

॥ সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা—ধর্ম বনাম সমাজ-সংস্কার ॥

সমাজ বৈজ্ঞানিকদের মতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানব জীবনই সমাজ এবং সমাজের আরও অনেক স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক উপাদানের ন্যায় ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাববাদী কিংবা বস্তুবাদী যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমরা তাকাই না কেন, 'ঈশ্বর দর্শনের উপায়', 'আত্মোপলব্ধি', 'মোক্ষ' অথবা 'সাধারণ মানুষের আফিম'[১] যে সংজ্ঞা দেই না কেন, একথা মানতেই হয় যে ধর্ম আমাদের অস্তিত্বের মধ্যেই আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে "......rcligions do not come form without but from within......religious thought is in man's very constitution, so such so that it is imposible for him to give up religion until he can give up his mind and body, until he can give up thought and life."[২] এবং ধর্ম বাস্তবেরই প্রতিবিম্ব। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় ধর্ম প্রায়ই বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা হেতু মানুষকে জগৎ থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগ্রহ প্রসূত প্রচেষ্টার প্রকাশ মাত্র। কারণ জীবনের দুঃখ যাতনার প্রতিক্রিয়া রূপেই ধর্মের জন্ম। অথচ ধর্ম বাস্তব জগৎ থেকে "দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে—তাকে বাসোপযোগী করে তোলার জন্য উদ্যোগী না হয়ে—বাস্তব জগৎ থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় এক দুঃখহীন আদর্শ ভাবজগতে।"[৩] সমাজে দুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন নিপীড়নের ফলে সৃষ্ট "দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব তখন ধর্ম রক্ষাকর্তা। সে প্রতিবাদ করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এক নতুন পদ্ধতিতে। অসহায় মানুষকে দেয় সান্ত্বনা, ইঙ্গিত দেয় পরোক্ষ প্রতিকারের।"[৪] বস্তুবাবী এই ব্যাখ্যায় মানুষের ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ অনুপস্থিত কারণ অলীক সুতরাং অবাস্তব। বহু বিতর্কিত এই আলোচনায় না গিয়েও আমরা জানি যে সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সামগ্রিকভাবে জীব ও জগৎ ভিন্ন অথবা অভিন্ন সত্তা এই বিচারধর্মগুরু, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিষয়বস্তু। আমরা জানি মূল উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে দৃশ্যমান এই জগতের উৎপত্তি।

সদা পরিবর্তনশীল জগতের গর্ভে সুপ্ত জীবন অংকুরের ক্রমবিবর্তনের ফলস্বরূপ আমরা মানুষ বর্তমানে সমাজবদ্ধ প্রগতিশীল জীব। মানুষের সমাজের এই বিবর্তনের ইতিহাসই মানব ইতিহাস। সমাজ বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার সুবিধের জন্য ঐতিহাসিক যুগকে আদি, আদি-মধ্য, মধ্য ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষের ইতিহাস রচনা করেছেন।

শ্রীমন্তশংকরদেব জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে। সন তারিখের বিচারে তাই তিনি মধ্যযুগের মানুষ। অসমে এই যুগ ছিল জনগোষ্ঠীবাদ থেকে সামন্তবাদে উত্তরণের যুগ। ইউরোপীয় রেঁণেসা বা পুর্ণজাগরণের (১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সূচনা বর্ষ) সমকালীন হওয়ায় অসমীয়া বিদ্বৎ সমাজের কেউ কেউ শ্রীমন্তশংকরদেবের যুগকেও পুর্ণজাগরণ বা নবজাগরণের যুগ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ বর্মণ প্রমুখ আধুনিক গবেষকরা সঙ্গত কারণেই শ্রীশংকরদেবের যুগকে 'পুর্ণজাগরণ' না বলে শুধু 'জাগরণের, যুগ আখ্যা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করছেন। কারণ ইউরোপীয় পুর্ণজাগরণের সামগ্রিক পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আর্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসমের এই যুগ ছিল প্রকৃতপক্ষে জনগোষ্ঠিতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের যুগ।

ইতিহাসের আদিকাল থেকেই নীলপাহাড় আর সবুজ সমতল-উপত্যকায় বিস্তৃত ভারতের এই বিশাল উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডে নানা জাতি-উপজাতির বসবাস। নৃতত্ত্ববিদদের মতে বোড়ো-কাছারী জাতি অসমের প্রাচীনতম অধিবাসী। পরবর্তীকালে নাগা, মিরি, মিস্‌মী, মিজো, খাসি প্রভৃতি উপজাতি বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে এসে অবিভক্ত অসমের বিভিন্ন স্থানে যুগ যুগ ধরে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছে। সবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (খৃঃ ১২২৮) বর্তমান থাইল্যাণ্ড থেকে সিনো টিবেটান (Sino-Tibetan) জাতির 'আহোম' নামে একটি শাখা উপজাতি এসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসম বা আহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে ভাবতীয় ঐতিহ্যের সুমহান ভাতৃসুলভ সংমিশ্রণ-মিলনের প্রভাবে, নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে বিশ্বাসী এই সব নানা জাতি-উপজাতি নিয়ে গড়ে উঠে বৃহত্তর অসম এবং অসমীয়া জাতি। কিন্তু "এক-জাতি এক-প্রাণ" বা "শান্তিপূর্ণ সহবস্থান" সেযুগে ছিল সুদূর পরাহত। জাতি বৈষম্য থেকে জাতি বিদ্বেষের ফলে উপজাতি কলহ-বিবাদ ছিল কখনও কখনও প্রতিদিনের ঘটনা। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকায় রাজশক্তি অস্থির, ফলে শাসন-ব্যবস্থা

ছিল শিথিল। রাজ্যে সামান্যতম অরাজকতার সুযোগে সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তৎপর ছিল।

শ্রীমন্তশংকরদেবের সমকালীন অসম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্থ-সামাজিক চিত্র অনুধাবনের জন্য সেই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তার ফলস্বরূপ একদিকে আভ্যন্তরীণ সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বহিরাক্রমণ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, ফলাফল, জনসাধারণের উপর তার ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভাব ইত্যাদি পর্য্যালোচনা প্রয়োজনীয়।

শ্রীশংকরদেবের সময় অসম বা আহোম রাজ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছিল সীমাবদ্ধ। আহোম রাজ্যের পশ্চিমে 'কামরূপ' রাজ্য এবং তারও পশ্চিম-উত্তরে 'বেহার' (কোচবিহার) শ্রীমন্তশংকরদেবের সময়ে অসমের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অসম রাজ্যের সীমা ছিল পূর্ব অসমের নামদাঙ্ নদী পর্য্যন্ত। উত্তরে নামদাঙ্ থেকে দক্ষিণে কলং নদী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড ছিল কাছারী রাজ্য। এবং বর্তমান অরুণাচলের পূর্বপ্রান্তে ছিল 'চুতিয়া রাজ্য'। এই রাজ্যের রাজনানী ছিল 'সদিয়া'।

আমরা আগেই বলেছি শ্রীশংকরদেবের যুগ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ, রাজ্যের উত্থান-পতন, আভ্যন্তরীণ কলহ, অরাজকতা, প্রজা উৎপীড়ন ইত্যাদি ছিল সেই সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা। শ্রীশংকরদেব তার সুদীর্ঘ জীনকালে চারজন স্বনামধন্য আহোম নৃপতির রাজত্বকাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা চুচেনফার (খৃঃ ১৪৩৯-৮৮) রাজত্বকালে। আহোম রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী ছিল মধ্যঅসমের রঙ্পুর। চুচেনফার মৃত্যুর পর তার পুত্র চুহেনফা (খৃঃ ১৪৮৮-৯৩) সিংহাসন আরোহন করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর পর ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে বসেন চুহুং মুং বা দিহিঙীয়া রাজা (খৃঃ ১৪৯৭-১৫৩৯)। হিন্দু নাম "স্বর্গনারায়ণ" গ্রহণ করা তিনই প্রথম আহোম নৃপতি। রাজা কর্তৃক প্রজার ধর্মগ্রহণ একাধারে প্রজানুরঞ্জন এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একরকম সাক্ষ্য ইতিহাসে বিরল। শ্রীমন্তশংকরদেবের তিরোধানকালে আহোম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন চুখাংফা (খৃঃ ১৫৫২-১৬০৩) যিনি অসমের ইতিহাসে 'খোরা রাজা' নামে সমধিক পরিচিত।

প্রথম জীবনে শ্রীশংকরদেব আহোম-কাছারী, আহোম-চুতিয়া এবং ভূঞা-

কাছারী ইত্যাদি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং তার ফলস্বরূপ নানা ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন একজন ভূঞা সামন্তপ্রভু।

অল্পকালমধ্যে অসমের পশ্চিম-উত্তরে (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ইতিহাসের দ্রুত পট-পরিবর্তন হয়ে যায়। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে খেনবংশের নবম ও শেষ নৃপতি নীলাম্বরের পরাজয়ের ফলে পরাক্রমশালী কামতা রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। দেখা দেয় আভ্যন্তরীণ অরাজকতা, সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাবৃদ্ধির লড়াই এবং একদিকে রক্ষণশীল ধর্মীয় কঠোরতা এবং অন্যদিকে নিঃস্ব দরিদ্র প্রজা উৎপীড়ণ। এদিকে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অসমের উত্তর-পুর্ব প্রান্তের চুতিয়া রাজা ধীরনারায়ণ আহোম রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু আহোম রাজ স্বগানারায়ণের নিকট পরাজিত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর নিজ রাজধানী সদিয়ায় ফিরে যান। ইতিমধ্যে কামতা রাজ্যের পতনের পর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাব হেতু আভ্যন্তরীণ অরাজকতা—অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ভূঞা সামন্তপ্রভুদের পরাস্ত করে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেহার' (অধুনা কোচবিহার) নামক স্থানে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই অঞ্চলের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় ঘটনা ছিল ১৫১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ভূঞা-কাছারী সংঘর্ষ এবং শ্রীমন্তশংকরদেবের ভূঞা রাজ্যের নিজ গ্রাম বরদোবা ছেড়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে আহোম রাজ্যে গমণ এবং পরে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসর গাংমৌ নামক স্থানে বসবাস। পরে কাছারী-ভূটিয়াদের অত্যাচারে সেখানেও থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় শ্রীমন্তশংকরদেব গাংমৌ ছেড়ে মাজুলি দ্বীপে (ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম) চলে যান এবং 'ধূয়াহাটা' নামক স্থানে ভক্ত শিষ্যগণ সহ প্রায় আঠার বৎসর বসবাস করেন। এই ধূয়াহাটাতেই শ্রীশংকরদেবের প্রধান ভক্ত ও উত্তরসুরি শ্রীমাধবদেবের সঙ্গে মিলন ও তার ফলে আহোম রাজ্যে তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে 'এক শরণ নাম ধর্মের' প্রচার এবং প্রসার অসমের সামাজিক ও ধর্মীয় পটপরিবর্তনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনতিকাল মধ্যে আহোম রাজ স্বর্গনারায়ণ

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে চুতিয়া রাজ্য অধিকার করেন এবং তার দুই বৎসর পর ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে আহোম কছারী যুদ্ধে কছারীদের পরাজিত করায় আহোম রাজত্বের প্রভূত প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। কারণ পরবর্তীকালে (১৫২৭-৩২ খৃষ্টাব্দ) অল্পসময় মধ্যে পরপর তিনবার মুসলিম আক্রমণ হলেও তিনবারই তারা পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এরপর অবশ্য ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ প্রতাপশালী কোঁচ রাজ নরনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সেনাপতি চিলারায় আহোমদের পরাজিত করে কামরূপ অধিকার করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে নারায়ণপুর পর্যন্ত আহোম রাজ্যে কোচ আধিপত্য বিস্তার করেন। পরবর্তী আহোম-কোচ যুদ্ধে সেনাপতি চিলারায় দ্বিতীয়বার আহোমদের পরাজিত করে দিখৌ নদী পর্যন্ত কোচ রাজত্বের প্রভাব বিস্তার করেন। এই সময়কার আর একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ার মত গৌড়াধিপতি নবাব স্থলেমান করনাণির সেনাপতি কালাপাহাড়ের কামরূপ আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে 'যোগীণিতন্ত্র' ও 'কালিকাপুরাণ' রচনাস্থল এবং পৌরাণিক শাস্ত্রে উল্লিখিত এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্তপীঠ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার এই অশান্ত পটভূমিকায় শ্রীমন্তশংকরদেবের সুদীর্ঘ জীবন ছিল এক রাজনৈতিক অস্থিরতার ইতিহাস। জীবন সায়াহ্নে কোচরাজ মহারাজ নরনারায়ণের আশ্রয়ও তার ব্যতিক্রম ছিলনা, যদিও এই রাজদরবারেই ঘটেছিল তার ধর্মীয় জীবনের আধ্যাত্মিক পরীক্ষা ও তার ব্যবহারিক সফলতা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই অঞ্চলে বসবাসকারী নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণে বিশ্বাসী ছোট বড় নানা জাতি উপজাতি সেই সময়ে ছিল বহুলাংশে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন। অত্যাবশ্যকীয় সামান্য ব্যবহারিক বাণিজ্যিক আদান প্রদানের বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোন মেল বন্ধন তখনও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই জাতি বৈষম্যের ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাদের মধ্যে কলহ বিবাদ তখন প্রায়ই লেগে থাকত। অপরদিকে জাতিভেদ প্রথার বিষময় ফলস্বরূপ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণা উৎপীড়ণ ছিল সমাজ জীবনে দৈনন্দিন ঘটনা। জাতপাতের বিচার, কর্মফল জন্মান্তরবাদের নিস্ফল-আশ্বাস, পরলোকের ভয় ইত্যাদির অনুশাসনে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছিল চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস। যুগ-যুগান্তর প্রচলিত এই জাতিভেদ প্রথা সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈষম্য-বিদ্বেষের ফলে তৎকালীন অনমীয়া সমাজ ছিল

এক অচল অনড় অসহায় অগ্রগতিহীন স্থবির সমাজ। এই সাথে আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে সে যুগের একমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি কৃষি ছিল সম্পুর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। তদুপরি ত্রুটিপূর্ণ ভূমিবণ্টন ও কঠোর কর প্রথার ভারে সাধারণ প্রজাবর্গ ছিল দরিদ্র নিঃস্ব। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ ইত্যাদির অভাবে ভারত উপমহাদেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন তৎকালীন অসমের সমাজ জীবন ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই অনগ্রসর। জীবন যাত্রা ছিল গ্রামে বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফলে একদিকে রাজা তথা সামন্তপ্রভু ও ধর্মগুরুদের দ্বারা নিঃস্ব দরিদ্র প্রজাদের শোষণ, ঘৃণ্য দাস-প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, জাতিভেদের নিষ্পেষণ এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী জর্জরিত সমাজ চিত্র ছিল ভয়াবহ।[৫]

প্রাক-শংকরী যুগে ও শ্রীমন্তশংকরদেবের আবির্ভাবকালে অসম তথা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে হিন্দুধর্মের শাক্ত-তান্ত্রিক সম্প্রদায় ছিল ধর্মীয় আচার আচরণের শীর্ষ নেতৃত্বে। ইতিপূর্বে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজত্বের কাল থেকে অর্থাৎ সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা থেকে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম জাগ্রত হয়ে উঠে। পরবর্তী সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে সামন্তবাদী ভাবাদর্শের পূর্ণ বিকাশের কালে শংকরাচার্য্য (৭৮৮ খৃষ্টাব্দ-৮২৮ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটিয়ে হিন্দুধর্ম সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে হিন্দুধর্ম আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চণা, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে উঠায় ধর্মাচরণ রাজা, অভিজাত সামন্তপ্রভু এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়। তখন সমাজের নিম্নবর্ণের দরিদ্র জন-সাধারণের জীবনে ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় উচ্চশ্রেণীর শোষণ উৎপীড়ণের আর একটি শক্তিশালী অস্ত্র। ইতিমধ্যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের আগমণ শুরু হওয়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়। অপ্রতিরোধ্য ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া সত্বেও ইসলামের ধর্মীয় সরলতা, একেশ্বর-বাদ, জাতিভেদ হীণতা, ভাতৃত্ববোধ হিন্দুদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বাধা উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম কঠোরতা আর অপরদিকে স্বচ্ছলতর জীবনের প্রলোভনের বিরুদ্ধে "সামাজিক বিপ্লব" ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। ফলে শংকরাচার্য্যের পরবর্তী ভারতে শুরু হয়ে যায় আর এক ধর্মীয় নবজাগরণ। প্রাক-শংকরী যুগে যৎসামান্য বিষ্ণু দেবতার পূজা প্রচলিত থাকলেও অসমে

মহাপুরুষ শংকরদেবই এই বৈষ্ণব ধর্মের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক, প্রবর্তক ও প্রচারক।

আগেই বলা হয়েছে যে,খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাক-শংকরী যুগে এবং শ্রীমন্ত শংকরদেবের জীবনকালেও অসমে প্রচলিত ধর্ম ছিল শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্ম। উল্লেখ-যোগ্য যে এই অঞ্চলে তৎকালীন অনুন্নত কৃষিপদ্ধতি নির্ভর জনগোষ্ঠীবাদী সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সমাজে নারীর স্থান ছিল প্রধান, পুরুষ ছিল গৌণ। শাক্ত দেবীগণ ছিলেন ধরিত্রীর উর্ব্বরতা ও ফলপ্রসূতার প্রতীক। একমাত্র দেবীর তুষ্টি বিধান দ্বারাই জীবন সংগ্রাম অব্যাহত রাখা সম্ভব, এই ছিল বদ্ধমূল বিশ্বাস। শস্য উৎপাদন প্রকৃতির উর্ব্বরতা শক্তি নির্ভর। তাই উর্ব্বরতা ও ফলপ্রসূতা প্রক্রিয়ার মানবিক অনুষ্ঠান দ্বারা দেবীর আরাধনা ও সন্তুষ্টি বিধান ছিল এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। পশু বলি, নর বলি (যোগিণীতন্ত্র ও কালিকা পুরাণ মতে—নরেণ বলিনা দেবী সহস্রং পরি বৎসরাণ্। বিধিদত্তেণ চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্ণ রৈঃ॥"—কালিকা পুরাণ ৬৭। ১৯) ধরিত্রীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক জ্ঞানে নরনারীর যৌনাচার, পঞ্চমকার ইত্যাদি উপকরণ সহযোগে দেবীর পূজা-অর্চনা ছিল ধর্মানুষ্ঠান। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে আদিম যুগের অন্ধ কুসংস্কার বিবেচিত হলেও এই সব আচার অনুষ্ঠান ছিল প্রকৃত পক্ষে জীবন ধারনের পক্ষে অত্যাবশ্যক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তব ধর্মসম্মত প্রক্রিয়া।[৩] কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণদের সাহায্য-সহায়তা পুষ্ট এই শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণ ছিল সে যুগের প্রবল প্রভাবশালী ধর্মীয় আদর্শ। প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম এমন কি বৈষ্ণব ধর্মও এই প্রভাবশালী ধর্মাচরণ থেকে মুক্ত ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে শাক্ত-তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশের ফলে সেই ধর্মের পতন তরান্বিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন শৈব-শাক্ত ঐতিহ্যপুষ্ট। চরিতকারদের মতে শ্রীশংকরদেবের পূর্ব পুরুষ চণ্ডিবর ছিলেন শাক্ত। কথিত আছে কুসম্বর ভূঞা শিব পূজান্তে শিবের বর লাভের পরেই শ্রীমন্তশংকরের জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখা হয়েছিল শংকর। কুসম্বর ভূঞা ছিলেন দেবী পূজক। নাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে শ্রীমাধবদেব ছিলেন শাক্ত। চরিতকারদের বিবরণ থেকে জানা যায় শ্রীশংকর শিষ্য মাধবদেব মাতৃশ্রাদ্ধে ছাগ বলির আয়োজনে উদ্যোগী হওয়ায় শ্রীমন্তশংকরদেব আপত্তি করেন। তারপর দেবী পূজার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্কবিতর্কের পর মাধবদেব পরাজয় মেনে নিয়ে শ্রীশংকরদেবের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগে শ্রীমন্তশংকরদেব শিষ্য অনন্ত কন্দলিও শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীবাদী সমাজের প্রতিভূ শাক্ততান্ত্রিক ধর্মাদর্শের সহিত পিতৃতান্ত্রিক সামন্তবাদী সমাজের প্রতিভূ বা ভাবাদর্শ বৈষ্ণব ধর্মের অবিশ্বম্ভাবী সংঘাত সংঘর্ষ ছিল ঐতিহাসিক ভাবে স্বাভাবিক।

উপরিউক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় শ্রীমন্তশংকরদেবের আবির্ভাব ছিল অসমীয়া সমাজ জীবনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক, আধুনিক "অসমীয়া জাতির জনক" এবং অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতির "শিরমণি স্বরূপ" শ্রীমন্তশংকরদেবের বহুমুখী প্রতিভা বিদগ্ধ পণ্ডিত জনদেরও বিস্ময়বিভূত করে। তার বহুমুখী প্রতিভার বিশেষ করে তার বিশাল সাহিত্য কৃতির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার যার পরোক্ষ ফল ছিল সমাজ-সংস্কার। কিন্তু তার একশরণ নাম ধর্ম প্রচারের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতার লড়াই এবং নানা জাতি-উপজাতির দ্বন্দ্ব কলহ। শ্রীমন্তশংকরদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্রই দেশে শান্তি স্থাপনে সক্ষম। তাই তিনি রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। একাধিক ধর্ম প্রচলিত রাজ্যে রাজা যদি কোন একটি ধর্ম বিশ্বাসে বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে স্বধর্মীয় প্রজাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ করেন তবে ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে। ফলে রাজ্য ও রাজত্ব রক্ষা হয় সুকঠিন, পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে মহামতি অশোক, ইংলণ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লস প্রভৃতি নৃপতিদের রাজত্বের অবসান এই ভয়াবহ পরিণতির সাক্ষ্যবহন করে। রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস প্রায় অনুপস্থিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাজকার্য্যে রাজা হবেন ধর্ম নিরপেক্ষ। শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত ভক্তিবাদ বা ভক্তিধর্ম ছিল মধ্যযুগীয় অসমে রাজতন্ত্র সুদৃঢ় করার ভাবাদর্শ। চরিতকারদের মতে আহোম-কাছারী যুদ্ধে জয়লাভের জন্য শ্রীমন্তশংকরদেব আহোম রাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কোচ-আহোম যুদ্ধের সময়ও তিনি কোচ রাজকে কূটনৈতিক পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে চরিতকারদের রচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমন্তশংকরদেব চেয়েছিলেন রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সমাজে এক বিশেষ ধরণের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম মানুষকে কেবল এক "অলীক দুঃখহীন আদর্শ ভাব জগতে" নিয়ে যায়

না। ধর্ম মানুষকে কর্মেও প্রবুদ্ধ করে। আমরা জানি ধর্মের নামে সশস্ত্র যুদ্ধ বা রাজ্য বিস্তারের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। সে যাইহোক, ধর্ম মানুষের পারমার্থিক সম্পদ। কিন্তু একই সাথে ধর্ম আমাদের অত্যাবশ্যকীয় নৈতিক সম্পদ ও আমাদের কর্মের অনুপ্রেরণা। গীতোক্ত ধর্মকে শুধু পারমার্থিক লাভের বা মোক্ষ লাভের জন্য তাত্ত্বিক আলোচনা আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মতে, "সমস্ত বিদ্যা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তত্ত্ববিষয়ক (Theoritical) ও ব্যবহারিক (Practical)। কোন বিদ্যার তত্ত্বাংশ না জানলে তার সুপ্রয়োগ হতে পারে না।……গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব অনেক আছে, তথাপি এতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হয়েছে। গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড়জোর বলে—এই জন্য ভাল, এই জন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।"[৭] ধর্ম আমাদের কর্মেও প্রবুদ্ধ করে। তাই গীতা পাঠ শেষে আমরা দেখতে পাই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞান আহরণের পর অর্জুন কর্মবর্জন বা নৈষ্কর্ম অবলম্বন করেননি। বরং তৎক্ষণাৎ কর্মারম্ভ করেন। পরিত্যক্ত গাণ্ডীব হাতে তুলে নিয়ে স্ববিক্রমে অর্জুন যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় অসমে সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা। শ্রীমন্ত-শংকরদেবের যুগে (খৃঃ ১৪৪৯-১৫৬৮) সেই সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থা ছিল দুঃখজনক। সমাজের অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূর করে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে আবশ্যিক কাজ ছিল তার নাম "সমাজ বিপ্লব" বা সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সে যুগে ছিল ঐতিহাসিক ভাবে অসম্ভব। কারণ বস্তুবাদী আদর্শে সমাজ বিপ্লবের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত ধনতন্ত্র, পুজিবাদ ইত্যাদি ছিল অনুপস্থিত বা অনাগত। বিপ্লবের হাতিয়ার শ্রমিক ঐক্য, শ্রেণী সংগ্রাম অজানা অপরিচিত কারণ শিল্পবিপ্লব ছিল অজ্ঞাত। পরবর্তীকালের জাতি বা জাতীয়তাবাদ তখনও কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণের প্রতীক্ষায়।

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ হীরেন গোহাঞিঁর মতে "বিপদের ভয় হরণকারী সংসার অগ্নির দাহন থেকে মুক্তিদাতা ভক্তবশ হরি অবতারে নিহিত

আছে (এই) পিতৃতান্ত্রিক সামন্তপ্রভুর ভাবমূর্তি। ভক্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রভুর অন্তর জয় করে নিজের জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস পায়। গোষ্ঠীপতি সামন্ত-প্রভুতে পরিণত হওয়ার বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ছিল এই আধ্যাত্মিক মতবাদ।"[৮] গবেষক অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ বর্মনের মতে "বৈষ্ণব ধর্ম সামন্তবাদী সমাজের সামন্তপ্রভুর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ভাবাদর্শ ছিল।[৯] এই হচ্ছে বস্তুবাদ। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করে বিষয়ান্তরে যাওয়া সমীচিন হবে না। যুক্তিবাদ ও ভাববাদ দুটোই কি মানব অস্তিত্বে সত্য নয়? জন্ম-মৃত্যু দ্বারা সীমিত আমাদের জীবনে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে বস্তুবাদ যেমন বাস্তব সত্য তেমনি সত্য ভাববাদ। মানুষ বেঁচে থাকে এবং ভাবে। বাঁচতে বাঁচতে ভাবে বা ভাবতে ভাবতে বাঁচে। আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে কর্ম যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভাবনাও তেমনি অবিভাজ্য। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রীমন্তশংকরদেবের কর্মময় জীবন ও জীবনাদর্শ বিশ্লেষণান্তে তাকে একজন 'সমাজ বিপ্লবী' আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তা সমাজ বিজ্ঞানীদের বিচার্য্যের বিষয়। আমাদের মতে শ্রীমন্ত শংকরদেব ছিলেন "সমাজ সংস্কারক" "সমাজ বিপ্লবী" নয়। কারণ তা না হলে তার ধর্ম-দর্শনের আদর্শ যার ভিত্তিতে তিনি আজীবন তৎকালীন "দুঃখজনক" সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনতে অবিরত প্রচেষ্টা করেছিলেন তার প্রতিই অবিচার করা হবে। ঐতিহাসিক ভাবেও তা ছিল অসম্ভব। সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। পৃথিবীর আর সব ধর্মপ্রবর্তকদের ন্যায় তিনি চেয়েছিলেন তার জীবনাদর্শের জীবন্তরূপ। তিনিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ ভাবাদর্শ সম্মত ধর্মস্থান—সত্র, নামঘর; একাধারে সাধারণের সমবেত উপাসনা, ধর্মালোচনা ইত্যাদির জন্য আদর্শ মিলনস্থান এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সভাগৃহ। ভাববাদের ফসলকে বস্তুবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বা বস্তুবাদের ফসলকে ভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিবেচনা হবে ভ্রমাত্মক।

তীক্ষ্ণ মেধা ও অনুভূতির অধিকারী মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব তার ঐকান্তিক সাধনলব্ধ প্রেম-ভক্তি বলে উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মই তার সমসাময়িক নিবিড় অন্ধকার পথের একমাত্র প্রজ্বলিত দিশারী। ধর্মই হবে তার কর্ম জীবনের ব্যবহারিক মূল মন্ত্র। ধর্মের পথেই করতে হবে বাস্তব জগতের সকল সমস্যার সমাধান। বহুকাল প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য, জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয়

কুসংস্কার প্রভৃতির রাজনৈতিক বিপ্লবী সমাধান প্রচেষ্টা সমসাময়িক পটভূমিকায় হবে নিস্ফল, কারণ তা হবে অপ্রাসঙ্গিক, অসময়োচিত এবং ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব।

শ্রীমন্তশংকরদেবের জাতি গঠন প্রক্রিয়া প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। তিনি চেয়েছিলেন তার প্রবর্তিত 'একশরণ নামধর্ম' হবে নতুন অসমীয়া জাতির ধ্যান ধারণাগত ভাবাদর্শ। পাহাড়ে পর্বতে, সমতল উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, এমন কি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সকল মানুষ মিলে মিশে একত্রিত হয়ে গড়ে উঠবে বৃহত্তর অসমীয়া জাতি, এই ছিল তার সমাজ সংস্কারক জীবনের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাল্যে প্রকৃতির শান্ত সৌম্য পরিবেশের প্রভাব, কৈশোরে-যৌবনে গুরুগৃহে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি নানা শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পরে সুদীর্ঘ বার বৎসর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লব্দ ফল স্বরচিত কবিতা, গীত, কীর্ত্তণ, নাটক, উপাখ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মপ্রচার পরোক্ষভাবে ছিল সমাজ সংস্কার। শ্রীমন্তশংকরদেবের সাহিত্যে সমকালীন সমাজের পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু ভাগবত, পুরাণ, ধর্মীয় উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে বিধৃত ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শ চিত্র তার সাহিত্যের মাধ্যমেই জনমানষে পরিবেশিত হয়েছিল। এবং সাধারণ মানুষকে এক ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই কথা বুঝবার জন্য আবাল্য কৃষ্ণের কিংকর এই মহাপুরুষের প্রেম ভক্তির দিব্য অনুভূতি সম্পন্ন সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনেয় তাৎপর্য্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ধর্ম মানুষেয় আর্থ-সামাজিক জীবনের তথা বাস্তবের প্রতিবিম্ব। শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত "এক শরণ নাম ধর্ম" ছিল জনগোষ্ঠীবাদী মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে সামন্তবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের ফলে সৃষ্ট মানসিক পরিবর্তনের ভাবাদর্শগত ধর্মীয় প্রকাশ। এই ভক্তি-আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ ভক্তি-ধর্মপ্রচার এবং পরোক্ষভাবে সকল উচ্চ-নীচ জাতি-উপজাতির মানুষকে নিয়ে এক ধর্মের ছত্রছায়ায় এক জাতি এক প্রাণ গঠন। কিন্তু তৎকালীন সামন্তবাদী শাসকবর্গের মানসিকতা ছিল ভোগের মানসিকতা। সংযম, ত্যাগ, বিনয় ইত্যাদির উপর এই শ্রেণীর কোন আস্থা প্রায় ছিলই না। রজগুণসমূহ এই শ্রেণীর প্রিয় নৈতিকতা ছিল। অপরদিকে সমাজের নীচুতলার মানুষদের দর্শন ছিল দুইবেলা দুই মুঠো

খেয়ে বেঁচে থাকা। এদের নৈতিকতা ছিল তামসিক নৈতিকতা। সমাজের মধ্যবিত্তদের মানসিকতা ছিল সত্ত্ব গুণাশ্রয়ী। ফলে মধ্য ও নিম্নবর্গের মানুষদের অক্ষমতা স্বভাবতই এই শ্রেণীর মানুষদের প্রবুদ্ধ করেছিল নিবৃত্তি মার্গের প্রতি। অধ্যাপক ডঃ হীরেন গোহাঞি যথার্থ বলেছেন যে, "এই ধরনের নিবৃত্তি মার্গের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যাই হোক না কেন, এর ফলে সাধারণ প্রজাদের শাসকশ্রেণীর লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতি নির্বিকার ও সহনশীল করে তুলেছিল। ফলে সামন্ত শ্রেণীর সৌভাগ্য এবং শোষিত শ্রেণীর বৈষয়িক অবণতির পথ পরিষ্কার হয়েছিল।[১০] সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট এক শরণ নাম ধর্ম স্বভাবতই ছিল এক নতুন পথের সন্ধান। তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী শ্রীমন্তশংকরদেব জানতেন যে সামাজিক বৈষম্যের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য। ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তান্ত্রিকতার জনপ্রিয়তা এবং স্মৃতি শাস্ত্র শাসিত জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্যবাদের সম্মোহনী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে একধর্ম, একজাতিতে সংগঠিত করার মূল মন্ত্রই হবে তাঁর প্রবর্তিত নাম ধর্ম। এই সাথে জনগণের বোধগম্য এবং একই সাথে সর্বভারতীয় চৈতণ্যের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করার ভাষা "ব্রজবুলি" তার সাহিত্যের উপযুক্ত ৰাহন বিবেচনা ও ব্যবহার শ্রীমন্তশংকরদেবের এক অপূর্ব ব্যবহারিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "The use of Brajabali in Assamese is a case of direct participation in the common literary life in Eastern India."[১১] তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী শ্রীমন্তশংকরদেব একথাও জানতেন যে মনুশাস্ত্র শাসিত এবং স্বয়ং ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণরা তার ধর্ম সহজে গ্রহণ করবে না। তাই সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীমন্তশংকরদেব বলেছিলেন কলিতে "শূদ্র কৈবর্ত প্রধান" (ভাগবত ১২।১৮৪২৯)। হরি ভক্তির দুয়ার সব মানুষের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। শূদ্র, কৈবর্ত, চণ্ডাল সকলেরই নাম ধর্মে ছিল সমান অধিকার। তিনি বলেছিলেন, "ভকতিত নাহি জাতি অজাতি বিচার।" প্রেম ভক্তি জ্ঞান হলে জাতিভেদ বিচার দূর হয়ে যায়। শ্রীমন্তশংকরদেব সমাজ বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেননি, এমনকি তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধীও ছিলেন না। জাতিভেদ প্রথার প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। তিনি শুধু জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য ভক্তি ধর্মের

দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত এক শরণ নাম ধর্মের এই "সহনশীলতা" সুমহান ভারতীয় ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাক্ত, শৈব, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এমনকি মুসলমানদেরও এক শরণ নামে ধর্মে গ্রহণ শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবনের বাস্তব ব্যবহারিক দূরদর্শিতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। "নিরস আর কর্মকাণ্ডি যুক্তির দ্বারা নয় বরং গুরু ও ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির দ্বারাই অর্থাৎ মাত্র হৃদয়ানুভূতির দ্বারাই মোক্ষ লাভ সম্ভব।"[১২]

"তর্ক বেদাগম জ্ঞান যোগশাস্ত্রে
পুরুষকে করে অন্ধ।
কোটি কোটি জন্মে মোর নজানিবে
ইয়াত যার প্রবন্ধ॥"

(ভক্তি প্রদীপ ১২৯—শংকরদেব।)

এবং এই সঙ্গে স্মরণীয়,

"ভকতি সে চিত্ত ভকতি সে বিত্ত
ভকতি মোক্ষর বীজ।"

(ভাগবত দশম ১০৮৬৮৯—শংকরদেব।)

তাই প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যয় বহুল নানা আচার অনুষ্ঠান বর্জন ছিল ঐতিহাসিক এবং অর্থ নৈতিকভাবে অপরিহার্য্য। নাম ধর্মে ভক্তের প্রাধান্য তাই বারে বারে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কীর্তনের সেই অমর বাণী।

"তপ জপ যজ্ঞ দান সবে বিড়ম্বন।
কেবল ভক্তিতে তুষ্ঠ হোন্ত নারায়ণ॥"

(কীর্তণঘোষা—৮২৩, শংকরদেব।)

কথিত আছে প্রথমবার তীর্থ ভ্রমণের পর নিজ গ্রাম বরদোবায় ফিরে এসে স্বরচিত চিহ্ন যাত্রার অভিনয় দেখে শ্রীশংকরদেবের প্রগাঢ় প্রেম-ভক্তি উপলব্ধি হয়। সেই সময় শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলি সহ উপস্থিত ভক্তগণ অবতার জ্ঞানে শ্রীমন্তশংকরদেবকে গুরু মেনে নামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই শ্রীশংকর ভূঞা শ্রীশংকরগুরু রূপে পরিচিত হন।

প্রচলিত শক্তিশালী শাক্ত-শৈব ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বৈরিতা সত্ত্বেও শ্রীমন্তশংকরদেব তন্ত্রশাস্ত্রের দেহতত্ত্ব (ষড়চক্রবাদ) মেনে নিয়েছিলেন। তান্ত্রিক

দর্শনের "যা নাই দেহ ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" স্বীকার করে তিনি বলেছিলেন,—

"দেহর মহিমা আবে শুনিও বেকতে।
ব্রহ্মাণ্ডর গুণমান আছে শরীরতে ॥"

(অনাদি পাতন—১৯৯, শংকরদেব।)

শাক্তদেবী ভৈরবীর প্রতি বৈরীভাব থাকলেও ভৈরবরূপী শিবের প্রতি বৈষ্ণবদের বিদ্বেষ বিরোধ প্রতিফলিত হয় নাই। বরং বিষ্ণু শিবের অভিন্নতা শ্রীশংকরদেবের রচনায় স্পষ্ট। ভাগবতে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে শিবকে বলিয়েছেন,

"আত নকরিবা খেদ নাহিকে কিঞ্চিতো ভেদ
তোমারে আমারে এক কায়া।"

(ভাগবত ৮।৮৫৭৫, শংরদেব।)

বৈষ্ণব ধর্মের এই উদার সহনশীলতা, শাক্ত-শৈবদের ভক্তি ধর্মে গ্রহণ—নাম ধর্ম প্রচারের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে। ঈশ্বরের এই হরিহর আত্মা, হরকে হরির সহিত একাত্ম করে শ্রীমন্তশংকরদেব হরের মুখে হরির গুণকীর্তন শুনিয়েছেন,

"হরি সে পরম দেব। হরিকেসে কর সেব।
ব্রজন্তা পালন্তা সবে হরি। হরি পদ শিরে ধরি।
শ্রবণ কীর্তন করি। তেরে সে হরিব মায়া তরি ॥"

(ভাগবত ৮।৮৫৮১, শংকরদেব।)

এবং

"এহি জানি হরিহর ভেদ নকরিব।
দুইরো নাম গুণক সততে শুনিব ॥
কিন্তু একনিষ্ঠ করি হরিক ভজিব।
ব্রহ্ম হর চরাচর কৃষ্ণত দেখিব ॥"

(ভাগবত ১৭২৫৬-৭, শংকরদেব।)

সেই সময় প্রচলিত বলিবিধান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সহকারে পূজা-অর্চনা কেবল রাজা ও ধনী সামন্তপ্রভুদের পক্ষে সম্ভব ছিল। বৈষ্ণব ধর্মে ফুল-ফল, জল, বিল্বপত্র সহযোগে অপেক্ষাকৃত কমখরচ করে ধর্মানুষ্ঠানের বিধান সাধারণ মানুষকে সহজেই ভক্তিধর্মে আকৃষ্ট করেছিল। "অহম রাজ্যের লোক হরি ভক্তি ধরিলেক ; অহম রাজার লোক যত।"

বৈষ্ণব ধর্মের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার ফলে কর্মকাণ্ডী পাণ্ডিত্য অভিমানী ব্রাহ্মণরা এই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। শ্রীমন্তশংকরদেবের কর্মময় জীবনে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে আহোম রাজ্যে এবং পরে আহোম রাজ্য ত্যাগ করে কোচ রাজ্যে গমণ ব্রাহ্মণ্যবাদের এই বিরুদ্ধাচরণের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন এই বিরুদ্ধাচরণের পরোক্ষ ফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একশরণ ধর্মের সরলতা, উদার সহনশীলতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা এই ধর্ম বিস্তারের অন্যতম কারণ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীমন্তশংকরদেবের মহাপুরুষিয়া ভক্তদের মধ্যে প্রবীণ গোবিন্দ ছিলেন গারো, পরমানন্দ মিরি, নরহরি আহোম, জয়রাম ভোট বা ভূটিয়া, চান্দসা মুসলমান এবং রামরাম ব্রাহ্মণ।[১৩] চরিতকারদের মতে মহাতান্ত্রিক বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীদামোদরদেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে নাম ধর্মে শরণ নেন। ইনি ভাগবত ভট্টাচার্য্য নামেও পরিচিত।[১৪] চক্রপাণি দ্বিজ ভট্টাচার্য্য বহু জজমান ত্যাগ করে ভক্তি ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীশংকর রচিত দশম স্কন্ধ ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনন্ত কন্দলি ভক্তি ধর্মের শরণাগত হন।[১৫] একই সময় পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীশংকরদেবকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করার অভিলাষ ত্যাগ করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মতে অনন্ত কন্দলি ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উভয়েই কোচ রাজসভায় সভা পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নাম ধর্ম গ্রহণের আর একটি ঘটনা ঘটে শ্রীশংকর ভক্ত বুঢ়াখার ঘরে। কথিত আছে একদিন মাধবদেব প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ বুঢ়াখার ঘরে এক সভার আয়োজন করে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র, বামণাচার্য্য, রত্নাকর কন্দলি, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করেন। সভায় গীতা, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ শেষ হলে মাধবদেব, রামরায়, ব্যাসকলাই, রামরাম প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ সভায় যোগদান করে ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তর্কযুদ্ধে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যখন নাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন তখন ব্যাসকলাই সজোরে হরিনাম সহকারে নাম কীর্তন আরম্ভ করেন। সভাস্থ উপস্থিত সাধারণ শ্রোতারা নাম ধর্মের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন।

শ্রীমন্তশংকরদেব জানতেন যে সংঘর্ষ নয় সমন্বয়, সহনশীলতা ও সংশ্লেষণ দ্বারাই এক শরণ নাম ধর্ম জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ধর্ম কখনও ব্যক্তিগত বা

গোষ্ঠীগত সম্পদ নয়। ধর্ম মানব জীবনের পারমার্থিক সম্পদ। তাই শ্রীমন্তশংকরদেব কোন ধর্মের প্রতিই বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না।

"পরের ধর্মক নিহিংসিবা কদাচিৎ......"

আজীবন তিনি ছিলেন ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে একজন অক্লান্ত যোদ্ধা। শ্রীমন্তশংকরদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন নি, বরং তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তা মেনেই নিয়েছেন। অবশ্য সার্বিকভাবে তিনি এই প্রথার প্রতি উদাসীন ছিলেন। নাম ধর্মে কোন জাতিভেদ প্রথা নাই। সব ভক্তই সমান ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনও এই ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল না। ভক্তি ধর্মে মূর্তি পূজার বিধান নেই। কিন্তু এই ধর্ম উগ্র পৌত্তলিকা বিরোধি নয়। শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই বরদোবায় চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তির পূজা করেছিলেন। ব্রহ্ম সংহতি সত্র সমূহে আজও বিষ্ণু মূতির পূজা প্রচলিত দেখা যায়।

সমসাময়িক অসমীয়া সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ছিল অতি প্রকট। জনসাধারণের অধিকাংশ ছিল দরিদ্র নিঃস্ব। অসমীয়া সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সেই সময় একমাত্র উৎপাদন সূত্র কৃষিকার্য্যের প্রতি শ্রীশংকরদেব তথা বৈষ্ণব ধর্মের উদাসীনতা ছিল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ। সমাজ বিজ্ঞানীদের এই অভিযোগ অনস্বীকার্য্য। কিন্তু পার্থিব সম্পদের প্রতি উদাসীন হলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ধন সম্পত্তি আহরণে শিষ্যদের সর্বদাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন। অধ্যাপক শিবনাথ বর্মন উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমন্তশংকরদেব "ঠগামি ভণ্ডামী না করে পশুদের কষ্ট না দিয়ে, তদুপরি শুদ্ধমতে অর্থাৎ ভক্তদের দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে চাষাবাদ এবং ব্যবসায় করার জন্য শিষ্যদের পরামর্শ দিয়েছিলেন।"[১৬] চরিতকারদের রচনায় এই বিষয় একাধিক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বরদোবা চরিতে একটি চমৎকার তাৎপর্য্যপূর্ণ কাহিনীর উল্লেখ আছে। ব্যবসায়ী একভক্ত মরসুমে কমদামে নানাবিধ শষ্য কিনে রেখে মরসুম শেষে মূল্য বৃদ্ধি হলে বিক্রি করে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। তা দেখে অন্য ভক্তরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এই কথা শুনে শ্রীমন্তশংকরদেব একদিন ভক্তদের ডেকে বললেন, "আমার এক্ষণি একশত টাকার প্রয়োজন, কার কাছে আছে দাও।" কিন্তু কেউ দিতে পারলেন না। এই সময় দুইজন ব্যবসায়ী ভক্ত এসে গুরুর হাতে টাকা ভর্তি থলিটি দিতেই তিনি ঈর্ষান্বিত ভক্তদের বললেন,

"বেপারী ব্যাটার কাণ্ড দেখলে। এই রকম ভক্ত ধনী হলেও ক্ষতি নাই।"[১৭] নারায়ণ দাস বা ঠাকুর আতার কাহিনী এই বিষয় আর একটি চমৎকার তাৎপর্য্য-পূর্ণ ঘটনা। আহোম, কামরূপ রাজ্য এবং ভূটানে পান তামুল সরিষা ইত্যাদির বেপারী ভক্ত নারায়ণ দাস যথেষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি প্রায়ই গরিব সংসারী ভক্তদের অর্থ সাহায্য করতেন। শ্রীশংকর মাধবের উপস্থিতিতে তিনি একবার অপর ভক্তদের বলেছিলেন যে তিনি সম্পত্তিতে আসক্তি না রেখে লোভ সম্বরণ করেন নিজ দ্রব্যের উপর, মোহ নিজ বিত্ত, কাম নিজ ভার্য্যা, ক্রোধ নিজ দাস-দাসী ও পুত্র কন্যার উপর। ঠাকুর আতার এই মন্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীশংকর সব আশ্রমী ভক্তদের গৃহি ভক্ত নারায়ণ দাস সম হতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৮] সমাজের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার প্রতি শ্রীশংকরদেব প্রত্যক্ষ উৎসাহ দান না করলেও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। বরং তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি।

শ্রীমন্তশংকরদেব প্রথম জীবনে রাজা, কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণ ও নারীদের শরণ দেওয়ায় কুণ্ঠিত ছিলেন। নারীর জীবনে "পতিই সতীর গতি" এই ছিল তৎকালীন বৈষ্ণবদের বিশ্বাস। পরবর্তীকালে শ্রীশংকরদেব তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। নাতবউ কনকলতা, হরিদেব কন্যা ভুবনেশ্বরী প্রমুখ নারীরা সত্রাধিপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীশংকর নারী বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি নিজে দুইবার বিবাহ করেছিলেন। সাধারণভাবে শ্রীশংকর প্রবর্তিত একশরণ ধর্ম সন্ন্যাসবাদে বিশ্বাসী ছিল না। ভক্তিধর্মে সংসার ধর্ম পালন করেও ভক্ত হতে কোন বাধা ছিল না। একশরণ নাম ধর্ম মতে সংসারী লোকও কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তন করে তাঁর শ্রীচরণ লাভ করতে পারে।

অসমের প্রায় প্রতিটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত নামঘর এবং এইরকম শত শত নামঘর সমূহের প্রতি নির্দেশ ও তাদের কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধানের জন্য স্থাপিত আঞ্চলিক সত্রসমূহ শ্রীমন্তশংকরদেবের ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কারের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। নামঘর ভক্তিধর্মে শরণাগত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি গ্রামবাসীর সমবেত পাঠ ও উপাসনা গৃহ। নামধর্মের সরলতার আদর্শে নির্মিত সরলতম স্থাপত্যের নিদর্শন এই নামঘর জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অসমীয়াদের অতি পবিত্র ধর্মস্থান। একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে নিয়মিত হরি নাম শ্রবণ কীর্তন দ্বারা পরম

আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই নামঘর প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি নামঘরের সামাজিক মুল্য অনস্বীকার্য্য। কারণ নামঘর সমূহ নানা সামাজিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা নিষ্পত্তির জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সভাগৃহ। "A great contribution of Sankardeva towards building up of the Society is the establishment of a net-work of Satras (central monasteries) and Namghars (Village prayer-halls) on democratic lines. There are now more than six hundred Satras and thirty thousand Namghars in Assam······ while from the religious point of view the Namghar fills the place of the church or the temple, it serves other social purposes which the church or the temple hardly does. It is the common meeting place of the villagers not only for the daily prayers, but also for the maintenance of social justice, art and culture. The village folk meet here to take decisions on matters of religious, social and political importance and village disputes are often settled here······It is a village church, a village parliament, a village library and a village stage."[১৯]

শ্রীমন্তশংকরদেব উদ্ভাবিত সত্র সমূহ একাধারে ধর্ম সংস্থাপন ও ধর্মপালন দ্বারা সমাজ সংস্কারের আদর্শ প্রতিষ্ঠান। সত্র পরিচালন পদ্ধতি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নির্ভর ছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ভক্তদের মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না। তদুপরি সত্রীয়া সমাজে সব ভক্তদের অধিকার ছিল সমান। সত্রে ভক্তদের জীবন যাত্রা ছিল কঠোর ত্যাগ বৈরাজ্ঞের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে, "A monk's life was a life of renunciation and of simple but engaging duties······very simple were his belongings. A quilt made of nags begged of others, two waist clothes and a ground-shell for begging bowl or a pot was considered sufficient for him……Begging was the general means of livelihood for monks. A monk was not allowed to hoard things and, therefore, gave out to his brethren whatever exeeded

the limits of his small needs."[২০] কথিত আছে ভক্ত গোপাল দেবের শিষ্যগণ একবার ভোজনের সুবিধার্থে তাকে একখানা সুন্দর পাথরের থালা তৈরী করে উপহার দিয়েছিলেন। শ্রীগোপালদেব কিন্তু থালাখানা নিতে অস্বীকার করলেন। পাথরের থালা তার প্রয়োজন নেই, তিনি বলেছিলেন, "দু-বেলা দু' মুঠো খাবার জন্য দু'খানা কলা পাতাই যথেষ্ট।"[২১] সত্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ—সৎলোকের বাসস্থান বা সৎলোককে যে ত্রাণ করে। ভাবাদর্শগতভাবে যে স্থান ছিল,

"যত প্রবেশিলে তিনি তাপ দূর হয়।
সংসারক চের করি বৈকুণ্ঠে-চলয়॥"

(রামরায় গুণাবলী ৬৮৫)

বৌদ্ধ সংঘের ন্যায় সত্র সমূহ আদর্শ প্রতিষ্ঠান ছিল। সমসাময়িক অসমীয়া সমাজের নানা বৈষম্য-অসাম্য, ভেদাভেদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সত্রীয় সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ। মাধবদেবের জীবনী থেকে একটি ছোট অথচ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোচবিহার সত্রে অবস্থান কালে একদিন রাজার ধাত্রীমা ছোট বড় শ্রেণী অনুসারে সকল ভক্তদের একখানা করে বস্ত্র দান করেছিলেন। ধাত্রীমার এরূপ বৈষম্যমূলক দান কার্য্যে মাধবদেব অসন্তুষ্ট হয়ে "কোনো ভক্ত বর কোন ভক্ত ছোট তাক। মই নিচিনিলো চিনি আছে আই (মা) তাক", বলে ভক্তদিগকে কাপোর ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন লজ্জিত হয়ে ধাত্রীমা সবভক্তদের সমান বস্ত্র দান করেন।[২২]

তীক্ষ্ণ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন শ্রীমন্তশংকরদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বৈষম্য অসাম্যের ব্যবহারিক সমাধান ছিল তার সাধ্যাতীত এবং ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব। তাই পৃথিবীর আরো অনেক ধর্মগুরুদের ন্যায় তিনি এক আদর্শ সত্র সমাজ উদ্ভাবন করেছিলেন। শান্তি ও সাম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই সব সত্র ছিল একাধারে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উৎস ও সমাজ সেবা কেন্দ্র। জীবন ধারণের যাবতীয় বিষয় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নানা জনহিতকর কাজে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সত্র সমূহের অত্যাবশ্যকীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হত। সত্র ছিল মৃৎশিল্প, তাত শিল্প, কাঠ ও হাতীর দাঁতের তৈরী আসবাব পত্র, মূর্তি ইত্যাদি নানাবিধ কুটির শিল্পের উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমকালীন অসমীয়া সমাজ ব্যবস্থায় শ্রীমন্তশংকরদেব

প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্মে নিহিত সমন্বয়, সহনশীলতা ও ভাতৃত্ব বোধের প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে শ্রীচৈতন্যদেবের পরমানুরক্ত নিত্যানন্দের উত্তর পুরুষদের অনেকে ধর্মপ্রচারে উৎসাহিত হয়ে অসমে এসে সত্র স্থাপন করেছিলেন। কামরূপের দেরগাঁও অঞ্চলের "নিত্যানন্দ গোসাঁইর থান", জোরহাট জেলার বরপথার অঞ্চলের 'পুরুষত্তম সত্র', নগাঁও জেলার 'বরভাবাড়ি' সত্র শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং অসমে আজও নাম ধর্মের পবিত্র ধর্মস্থান।

দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে ত্যাগ বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সত্র সমাজ পূর্বেকার মহান আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। শ্রীমন্ত শংকরদেবের সাম্য শান্তির আদর্শ সত্রীয় সমাজ আজ আর অসমীয়া সমাজ জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। একদা জনমানসে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত সত্র সমূহ নানাভাবে নতুন যুগের নতুন মূল্যবোধের কাছে অংশত অপ্রয়োজনীয়, অবহেলিত।

কালক্রমে অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগে সত্রের ভক্তগণ ধীরে ধীরে শ্রমবিমুখ এমনকি বিলাস প্রবণ হয়ে উঠেন। একদিকে স্বার্থসন্ধানী রাজানুগ্রহের ধন এবং অপরদিকে স্ব-ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের গুরুকর বৌদ্ধ সংঘের সন্ন্যাসীদের ন্যায় বৈষ্ণব ভক্তদের ক্রমে অলস ভোগবিলাসী করে তোলে। ক্রমশ সত্রবাসী বৈষ্ণব ভক্তরা ব্যবহারিক বাস্তব জীবন ভুলে যায়। পার্থিব জগৎ মিথ্যা মায়া, একমাত্র সত্য কল্পনার ভাব জগৎ। শ্রীমন্তশংকরদেবের মহান ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ বিস্মৃত বিলাস বৈভবপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত শ্রীশংকর পরবর্তী বৈষ্ণব ভক্তদের হয়ে উঠেছিল আদর্শ। একশরণ নামধর্মের পবিত্র ধর্মস্থান ও সমাজসেবা কেন্দ্র সত্রসমূহ আজ সমাজ বৈজ্ঞানিকদের ও ঐতিহাসিকদের নিকট প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের ন্যায় শুধু গবেষণার বস্তু।

আজ শ্রীমন্তশংকরদেবের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পর বর্তমান অসমের প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সত্র অনুষ্ঠান সংকটকালে পলায়মান প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। দুঃখপূর্ণ বাস্তব জগৎ পরিহার করে স্বর্ণপুরীসম চিরশান্তিময় কল্পনার ধর্ম জগতে আনন্দে বসবাস প্রচেষ্টার ব্যর্থ প্রয়াস। ব্যবহারিক প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের আর্থ সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে দুঃখপূর্ণ পার্থিব জগৎকে বাসোপযোগ্য করে নেওয়ার উশদেশ না দিয়ে দুঃখকে স্বীকার করে এবং দুঃখপূর্ণ পার্থিব জগৎকে মায়াজ্ঞানে ত্যাগ করা ছিল সত্র অনুষ্ঠানের ভাবাদর্শ।[৪৩] আবার কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন 'আধুনিক

সমাজবাদের প্রবক্তা। "মানব সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।" একথা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য্য। তবে তৎকালীন সামাজিক চেতনা সম্পন্ন গুণীজনেরা সেকথা ভাবতেন কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ।

কিন্তু বস্তুবাদীদের সমালোচনা সত্বেও এবং বৈষ্ণব ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু হলেও জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আজও এই ধর্ম অসমের প্রধান জাতীয় ধর্ম। অধিকাংশ সত্র ধর্মানুষ্ঠান, সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চায় প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত। শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শ আজও প্রতিজন অসমীয়ার "ভালবাসার ধন", প্রত্যেক অসমীয়ার মনে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের আদর্শ এবং অসমীয়া শিল্প সংস্কৃতির অফুরন্ত উৎস।

॥ উপসংহার ॥

মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব অসম তথা ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আদর্শের এক অত্যুজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক। অসমীয়া জাতি ও জাতীয়তাবাদের জনক শ্রীশংকরদেব আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষেব বহু পূর্বেই বলেছিলেন যে, তিনি অসমীয়া হয়েও ভারতীয়। তাঁর 'অনাদিপাতন' গ্রন্থে আমরা পাই,

"সবাতে অধিক ইটো ভারত বরিষ।
যাত জন্ম লভিবাক দেবেরো হরিষ॥
... ...
... ...
রাত্রি দিনে আমি বাঞ্ছা করোঁ যাক লাগি।
হেন ভারতক পাইলো কিনো পুণ্য ভাগি॥" (১১২-১৩)

তাঁর একমাত্র সংস্কৃত রচনা "ভক্তিরত্নাকর"-এ "ভারতবর্ষের প্রশংসা" কবিতায় গর্বের সঙ্গে তিনি বলেছেন,

"দেব সবে নিশ্চয় গায় এহি গীত।
সেহি ধন্য যার জন্ম ভারত ভূমিত॥
ভারতত নরজন্ম লয়ার কারণ।
পারয় সাধিবে যার যেন প্রয়োজন॥

(৯৭৪ শ্রীশংকর শিষ্য রামচরণ ঠাকুর কৃত অনুবাদ)

নতুন প্রজন্মের অসমীয়া বুদ্ধিজীবিদের একাংশের কাছে শ্রীমন্তশংকরদেব আজ যতই অপ্রাসঙ্গিক মনে হোক না কেন, অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পর্বত প্রতীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহাপুরুষ "অসমের সামাজিক তথা মানসিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে এত গভীরভাবে বিজড়িত যে, কোন অসমীয়ার পক্ষেই তাঁর প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা অসম্ভব। প্রতিজন অসমীয়ার জন্য শ্রীমন্তশংকরদেব এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস"[১] হয়েই থাকবেন। এই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য্য যে, শ্রীমন্তশংকরদেব প্রচারিত সাম্য মেত্রী ও তাঁর ধর্মে নিহিত প্রেম, অহিংসা, বিনয়, করুণা ইত্যাদি মানবীয় প্রমূল্য সমূহের সার্বজনীন আবেদন চিরদিন অম্লান থাকবে।"[২]

শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন একজন কবি। সমকালীন কবিতায় প্রচলিত প্রায় সব ছন্দই যেমন, ছবি, দুলাড়ী, পয়ার, ঝুনা, ঝুমুরি, ঝমক, কুসুম মালা ইত্যাদি তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। এছাড়া স্বরচিত দু'-একটি ছন্দের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় আছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য "ভক্তি রত্নাকর" সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ কাব্যের নিদর্শন। এই গ্রন্থের শেষে সংস্কৃত তোটয় ছন্দে রচিত বিখ্যাত ভটিমাটি ভিন্ন কয়েকটি বরগীতও তাঁর এই অসামান্য কাব্যিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। একজন সুনিপুণ নাট্যকার, নাটক রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীমন্তশংকর একজন পারদর্শী অভিনেতাও ছিলেন। ধর্ম প্রচারে নাটকের ব্যবহার তাঁর মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভার এক অভিনব স্বাক্ষর। নাটকে আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষার ব্যবহারেরও তিনি পথিকৃত। সর্বোপরি তাঁর রচিত নাটকে ব্যবহৃত গদ্য অসমীয়া এবং কোন কোন ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ ভাষাবিদ। তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভারে সংস্কৃত তৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বজায় রেখেও তিনি প্রচুর অসংস্কৃত, অসমীয়া, ব্রজবুলি ও যাবনিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। তদুপরি শ্রীমন্তশংকর ছিলেন একজন সঙ্গীত বিষারদ। অসংখ্য কীর্তন পদ রচয়িতা তিনি নিজেই ছিলেন সুগায়ক, গীতিকার ও সুরকার। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংঙ্গীতের রাগরাগিণী নির্ভর তাঁর রচিত বরগীত সমূহ এক নতুন ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এছাড়াও তিনি ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী। বরদোবায় তাঁর রচিত চিহ্ন যাত্রা অভিনয়ের প্রারম্ভে সাত বৈকুণ্ঠের চিত্রাঙ্কণ ও পরে রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে একশত বিশ হাত দীর্ঘ "বৃন্দাবনী বস্ত্রে" কৃষ্ণলীলা অংকণ তাঁর শিল্প প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। একজন বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক হয়েও তিনি জানতেন যে তৎকালীন সমাজের আর্থ সামাজিক কাঠামোর আমুল পরিবর্তন করা ঐতিহাসিক ভাবে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি তাতে হতাশ হওয়ার কোন কারণ দেখেন নি। কৃষিবিদ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়ন তার উদ্ভাবিত সত্র সমূহের ছিল অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সর্বোপরি তিনি ধর্মগুরু। এককথায় শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন সর্বকলাবিষারদ। প্রখ্যাত অসমীয়া কবি জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালার মতে, "তার মত সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ সেই সময়ের পৃথিবীব কেন, আজকের পৃথিবীর মহাপুরুষদের মধ্যেও দুর্লভ। তিনি ছিলেন নতুন ধর্ম প্রবর্তক, দার্শনিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত। সমাজ সংগঠক ও নতুন সংস্কৃতির

স্রষ্টা, তিনি নিজেই ছিলেন নাট্যকার, নাটকীয় কারিগরীর উদ্ভাবক, নাটকের প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা, সংগীতের একটি ধারার প্রবর্তক গীত ও সুর রচনায় সিদ্ধহস্ত, নতুন নৃত্যভঙ্গীর পরিকল্পনা প্রণেতা এবং সর্বোপরি নাট্য বিশারদ এবং একই সাথে নতুন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, খোল-করতাল ইত্যাদির নির্মাণ এবং সেই সবের পারদর্শী শিল্পী। তিনি ছিলেন অসাধারণ কবি, নাট্য সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। অপরদিকে সত্রাদি স্থাপন করে, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের সংগঠক, রাষ্ট্রনৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করেও সব রকম মানবিক উৎকর্ষের মুকুট শিরমনি, বাস্তব জীবনকে অস্বীকার না করে গৃহী। মানুষের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও ব্যবহারিক সম্পদের এরকম পরিপূর্ণ বিকাশ ও তাদের সামঞ্জস্য সমতা একমাত্র শংকরদেবেরই দেখা যায়। সে জন্য বলা যায় যে শংকরদেবের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ ইতিহাসে বিরল। তিনি ছিলেন মানুষের পূর্ণ সংস্কৃতির প্রতীক।"[৩]

শ্রীমন্তশংকরদেবের কৃতিত্ব কী এবং কেমন অনুধাবন করতে হলে পূর্ব উল্লিখিত তাঁর সমকালীন অসমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সেই সময় অবিভক্ত অসমের দুর্গম ঘন নীল পাহাড়ে পর্বতে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উপজাতি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর পূর্বে আহোম, তারও পূর্বে চুতিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাছারী জাতির বসবাস ছিল। এছাড়া মধ্য অসমে ভূঞা সম্প্রদায় এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে কিছু ভাগ্যান্বেষী নবাগত নিয়ে ছিল অসম। মধ্যযুগীয় দুঃসহ সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, কলহ-বিবাদ, জাতি বিদ্বেষ, উচ্চশ্রেণীর শোষণ উৎপীড়ন জর্জরিত ছিল অসমীয়া সমাজ জীবন। শ্রীমন্তশংকরদেব তাঁর সহনশীল সমন্বয় নীতি নির্ভর নব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার দ্বারা সর্বপ্রথমে এক বৃহত্তর অসমীয়া জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব ধর্ম হয় অসমীয়া জাতির জাতীয় ধর্ম। তিনি সাধারণের বোধগম্য ব্রজবুলি মিশ্রিত অসমীয়া ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করে এক অসমীয়া জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করেন। সর্বোপরি এই ধর্ম ও ভাষার ঘনিষ্ঠতা হেতু সর্বভারতীয় চৈতন্যের সাথে একাত্মবোধ, অসমীয়া হয়েও ভারতীয়, এই ভাবাদর্শে আপামর অসমীয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীমন্তশংকরদেবের প্রতিভার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার তৃতীয় সাক্ষর তাঁর বাস্তবধর্মী জাতি গঠন প্রক্রিয়া।

একজন কালজয়ী প্রতিভাবান মহাপুরুষ তাঁর যুগের একাধারে স্রষ্ঠা এবং সৃষ্টি। একটা যুগসন্ধিক্ষণে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তাঁর আবির্ভাব। বহুধা বিভক্ত মধ্যযুগীয় অসমীয়া সমাজের প্রধান ঐক্যশক্তি, ডঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়ার মতে, 'a cementing force'। তিনি সব জাতির মানুষকে ভক্তিধর্মের আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরু। সন্দেহ নেই, শ্রীমন্তশংকরদেব অসমীয়া জাতি ও জাতীয়তাবাদের জনক, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বহুবিধ সাক্ষর অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সমাজে নিয়মানুবর্তিতা, আতিথেয়তা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা। ডঃ ভবপ্রসাদ চলিহার মতে, শ্রীমন্তশংকরদেব "Preached the principles of mutual co-existance, religious tolerance and brotherly relation among the people. The descipline and orderliness that we find in Assamese sociery, the unity and fellow feeling that exist among the peoplc of Assam are pre-eminently the results of Sankardeva movement in Assam. Assam is under a deep debt of gratitude to Mahapurush Sankardeva who created almost everything that goes to make Assam of today."[৪] শ্রীমন্তশংকরদেব আজও অসমীয়া জাতির প্রাণপুরুষ, অসমীয়া জনগণের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। কবি যতীন্দ্রনাথ দুয়ারার ভাষায়,

"অসমর রীতি-নীতি অসমর সদাচার,
অসমর ধর্ম-ভাব অসমর ব্যবহার—
সকলোকে তুমি দেব সজালা নতুন সাজে,
তোমার গরিমা গীতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে॥"

অসমের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলভিত্তি তার দেবপ্রতীম ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ দৈহিক বলের অধিকারী শ্রীমন্তশংকর ছিলেন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন দৃঢ় এবং অদম্য মনোবলের অধিকারী। তাঁর বাস্তব ব্যবহারিক বুদ্ধিও ছিল অত্যাশ্চর্য্যভাবে প্রখর। রণকৌশল অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় ধর্ম রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে তিনি পশ্চাদোপসরণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কাছারীদের অত্যাচারে প্রথমে নিজ বাসভূমি বরদোবা ত্যাগ করে

আহোম রাজ্যে গমণ এবং পরে আহোম রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আহোম রাজ্য ত্যাগ করে কামরূপ কামতা রাজ্যে বাস পরিরর্তন ছিল তাঁর এই বাস্তব ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষর।

বৈষ্ণয ধর্মে নিহিত 'ত্যাগ বৈরাগ্য' একশরণ ধর্মের মূল আদর্শ। তাই একথা অনস্বীকার্য্য যে, শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্ম বহুলাংশে জীবন বিমুখ ছিল।

"শুনা সমাজিক, কৃষ্ণর চরিত্র, অমৃত ইসে প্রধান।
অহিক্ষণে আছে অহিক্ষণে নাই টাটেক নাটক মায়া।
পদ্মপত্র জল জীবন চঞ্চল অথির মনুষ্য কায়া॥
(ভারবত, ১।২৫৬, শংকরদেব।)

কিংবা,

"পুত্রদ্বারা গৃহবাস মিছা তাত অভিলাস
সবে সপোণর নিধি প্রায়।
যতদেখা ধন ধান যাইবে তেতিক্ষণে প্রাণ
সঙ্গে এক রতিও না যায়॥
(নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ ৬৮-৬৯, শংকরদেব।)

ইত্যাদি ধরনের উক্তি শ্রীশংকরদেবের সাহিত্যে নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। যৌবনে ভূঞা শিরমণি পদ ত্যাগ, বিষয় সম্পত্তির দায়িত্বভার প্রথমে কাকাদের হাতে অর্পণ করে ধর্ম কর্মে আত্মনিয়োগ, পরে সমস্ত দায়িত্বভার জামাতার উপর অর্পণ করে দীর্ঘকাল তীর্থবাস নিঃসন্দেহে শ্রীমন্তশংকরদেবের বিবাগী মনের পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ বহুলাংশে জীবন বিমুখী হলেও তিনি কেবল জীবন-বিতরাগী দার্শনিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না, আজীবন তিনি ছিলেন অদৃষ্টবাদী আত্মতুষ্ট কর্ম-বিমুখ জীবনের ঘোর বিরোধী। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ-মার্গে অবস্থান করেও তিনি কোনদিন পুরুষাকারে বিশ্বাস হারাননি। প্রকৃত পক্ষে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের পশ্চাতে ছিল তাঁর বৈপ্লবিক মন, অফুরন্ত মনোবল ও ক্লান্তিহীন কর্মক্ষমতা। ডঃ শিৱনাথ বর্মনের ভাষায়, "শংকরদেবের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে তা হলো তার বৈপ্লবিক মন। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও নিজের বৈপ্লবিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার অদম্য সাহস।...একাধারে চিন্তাবিদ তথা কর্মবীর শংকরদেব

তাঁর আদর্শ প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি ছিলেন সদা ব্যস্ত।"[৫]

শ্রীমন্তশংকরদেব জ্ঞানযোগী হয়েও কর্মযোগে বিশ্বাসী, তিনি ছিলেন 'প্রেম-ভক্তি'র আদর্শ পুরুষ। প্রাত্যহিক জীবনের কোন বাধা, দুঃখ-যন্ত্রণা সামাজিক লাঞ্ছনা, বৈরীতা, ধর্মীয় গোড়ামি কোন কিছুই তাঁকে তাঁর জীবনাদর্শ তথা ধর্ম বিশ্বাস বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিরামহীণ সংগ্রাম থেকে বিরত করতে পারেনি। শৈশবে পিতৃমাতৃহীণ, গুরুগৃহে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কঠিণ অধ্যবসায় সহকারে নানা শাস্ত্র পাঠ, যোগাভ্যাস, গৃহে ফিরে সাংসারিক দায়িত্বভার বহন, বিবাহ, পত্নীবিয়োগ, কন্যার লালন পালন, বিবাহদান, বিষয় সম্পত্তি জামাতার হাতে সমর্পণ করে তীর্থ যাত্রা, দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসে ধর্ম কর্মে আত্মনিয়োগ, দ্বিতীয়বার বিবাহ, কাছারীদের অত্যাচারে দেশত্যাগ, আহোম রাজ্যে বাস, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের চক্রান্ত, রাজ রোষ, জামাতার শিরচ্ছেদ, একাধিক সন্তানের অকালমৃত্যু, আহোম রাজ্য ত্যাগ, কোচ রাজ্যে আশ্রয় লাভ ইত্যাদি সব কিছু মিলে শ্রীমন্তশংকরদেবের ব্যক্তিগত জীবন বহুলাংশে ছিল এক দুঃখময় জ্বালা যন্ত্রণার ইতিহাস। কিন্তু প্রবল বাধা সত্বেও তাঁর জীবনাদর্শ নাম ধর্মের জনপ্রিয়তা তাঁর অসাধারণ কর্ম প্রেরণার উৎস ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বিলাস বহুল জীবন যাত্রা ধর্ম জীবনের প্রধান বাধা। তাই তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয় সম্পত্তি ভোগের অনীহা, অযাচিত রাজ সম্মান, বিষয় প্রতিপত্তি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রত্যাখ্যান। সর্বোপরি তিনি তার অনলস দীর্ঘ কর্ম জীবনের প্রতিটি অবসর মুহূর্ত সাহিত্য সৃষ্টি, কবিতা, সংগীত, নাটক রচনা, ধর্ম উপদেশ এবং দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় অতিবাহিত করেছেন। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আপন প্রতিভার সাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ জীবনালেখ্য তাই আমাদের বিস্ময়াবিভূত করে। আমরা মুগ্ধ হই। শ্রীমন্ত-শংকরদেবের মত বিদগ্ধ গুণীজন সত্যই ইতিহাসে বিরল।

আজ শ্রীমন্তশংকরদেবের জন্মের সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর বর্তমান পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিকায় তাঁর জীবন ও জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা কতটা, এ বিষয় আলোচনার অবকাশ আছে। অসমীয়া বুদ্ধিজীবি মহলে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বস্তুবাদী সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে শ্রীমন্তশংকরদেব ছিলেন আধুনিক সমাজবাদের প্রবক্তা। সাম্য মৈত্রী ভিত্তি করে এক শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ

ব্যবস্থা ছিল তাঁর আদর্শ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তাঁর পক্ষে ঐতিহাসিক কারণেই অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ধর্মীয় আদর্শের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও তাঁর সহজ সরল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল একটা বৈপ্লবিক আদর্শ। নববৈষ্ণব ধর্ম সেই কাল্পনিক শোষণমুক্ত আদর্শ সাম্যবাদী সমাজের আন্তরিক উদাত্ত আহ্বান। আবার কোন কোন গুণীজনদের মতে শ্রীমন্তশংকরদেব প্রেম-ভক্তির আদর্শ। তার প্রবর্তিত একশরণ ধর্মের মূল বক্তব্য সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেয় পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তণ দ্বারা তাঁর সান্নিধ্য লাভই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রশ্ন, বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ধরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে রত সমাজ ব্যবস্থায় যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, রামকৃষ্ণের সাম্য-মৈত্রী প্রেম-ভালবাসার আদর্শ কী একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? না, তা নয়। আর তা যদি—না হয় তবে শ্রীমন্তশংকরদেব শুধু বর্তমান অসমীয়া সমাজে কেন, ভারত তথা বিশ্ব মানব সমাজেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় নি, যাবে না। একশরণ ধর্মে নিহিত অহিংসা, প্রেম, দয়া, সাম্য মৈত্রী ইত্যাদি অমূল্য মানবীয় সম্পদগুলোর সার্বজনীন আবেদন মানুষের মনে চিরদিনই উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকবে। শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তার সহনশীলতা ও সমন্বয় নীতি, সাম্য-মৈত্রী, অহিংসা, ভাতৃত্ববোধ মনে হয় বর্তমান পৃথিবীতে আজ বড় বেশী প্রয়োজন।

———

পৰিশিষ্ট (ক)

॥ উৎস সূত্ৰ ॥

প্ৰথম অধ্যায়

১। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—স্বামী বিবেকানন্দেৰ বাণী ও ৰচনা-নবম খণ্ড, পৃঃ—১৯৫।

২। "শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব"—মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—২৫।

৩। The Place of Assam in the history and Civilisation of India—Dr. Sunity Kr. Chatterjee, Page—16 ;

৪। শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—ডঃ মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—১৬৭।

৫। ঐ ঐ পৃঃ—২৯।

৬। শ্ৰীমন্তশংকৰদেব—হৰি নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা, সাহিত্যৰত্ন, পৃঃ—৭।

৭। ঐ ঐ পৃঃ—৬ এবং শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—ডঃ মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—১৬৯।

৮। The Place of Assam in the history and Civilisation of India—Dr. S.K. Chatterjee, P.—66 ;

৯। ঐ ঐ

১০। শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—৩৩, এবং শ্ৰীমন্তশংকৰদেব-কৃতি ও কৃতিত্ব, শিবনাথ বৰ্মন, পৃঃ—১৯০।

১১। The Place of Assam etc., Dr. S.K. Chatterjee, P.—69 ;

১২। শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—৪৫।

১৩। ঐ ঐ পৃঃ—৩৯।

১৪। শ্ৰীমন্তশংকৰদেব—কৃতি আৰু কৃতিত্ব—শিবনাথ বৰ্মন, পৃঃ—১৯১।

১৫। ঐ ঐ ঐ পৃঃ—১১৫।

১৬। শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—৭১।

১৭। শ্ৰীমন্তশংকৰদেব—কৃতি আৰু কৃতিত্ব, শিবনাথ বৰ্মন, পৃঃ—১৯৪।

১৮। Sankardeva and Gandhi—R. K. Saikia; P.—6 এবং শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেব—মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ—৯৬।

১৯। শ্রীশ্রীশংকরদেব, মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ—১০৬—৭।

২০। "রাজা মহারাজাদের ধর্মনিষ্ঠা সর্বসাধারণ মানুষের মত হয়না, বরঞ্চ তাহাদের ধর্মনিষ্ঠা পরিচালিত হয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদের দ্বারা" শ্রীমন্তশঙ্করদেব কৃতি আরু কৃতিত্ব শিবনাথ বর্মন, পৃঃ—৪৮। "মহারাষ্ট্রের তুকারাম শিবাজীর অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে শরণ দানে অসম্মত হন", ঐ পৃঃ—৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। B. K. Kakati—Vaisnavite Myths and Lgends, Gowahati 1951, Page 73.

২। Thomson, George—Aeschylus and Athens, London 1966, Page 15.

৩। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ৪৩।

৪। Weber, Max—The Sociology of Religion, Page 103.

৫। নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য – ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৪ শক, পৃঃ ২২৭। (ভাবানুবাদ)

৬। মহেশ্বর নেওগ—শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ১২০।

৭। " " — " পৃঃ ১৪২।

৮। " " — " পৃঃ ১৫০।

৯। " " — " পৃঃ ১৫১।

১০। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ৮৪।

১১। Maheswar Neog—Sankardev and his Times Page 327-28.

১২। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৪৬-৪৭।

তৃতীয় অধ্যায়

১। S. N. Sarma—All most all the works of Sankardeva and his followers are translations and compilations. No original work or comentary on any fundamental scriptures was written by them The Neo Vaisnavite Movement and the Satra Institution of Assam—Page 25.

২। শ্রীমন্তশংকরদেব—হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান (৬১৩-১৪)
৩। মহেশ্বর নেওগ—শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ১১৫।
৪। ঐ — ঐ পৃঃ ১১৬—১৮।
৫। রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী—শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ কর্তৃক অনূদিত, মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ৪২-৪৮, দ্রষ্টব্য।
৬। লক্ষীনাথ বেজবরুয়া—শ্রীশ্রীশংকরদেব, বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড।
৭। S. K. Chatterjee—Kirata Jana Kriti, Asiatic Society Calcutta, 1974.
৮। মহেশ্বর নেওগ—'শ্রীশ্রীশংকরদেব' গ্রন্থের পৃঃ ১২৩-১২৭। (অনুবাদ লেখকের)
৯। রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী—মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদেব,—পৃঃ ৬৩, ৬৭-৭০ উল্লিখিত গর্গনারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায়—'শ্রীশ্রীশংকরদেব ও মাধবদেবের বরগীত' পুস্তক হইতে গৃহীত।
১০। শিবনাথ বর্মণ—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব। পৃঃ ১৬৭, ১৭১ ও ১৭৭ হইতে গৃহীত। (অনুবাদ লেখকের)
১১। মহেশ্বর নেওগ—শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ১৩২-৩৩, (অনুবাদ লেখকের)।
১২। শিবনাথ বর্মণ—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৬৮। (অনুবাদ লেখকের)

চতুর্থ অধ্যায়

১। Marx, K & Engels, F.—"...It is the opium of the people." On Religion', Moscow, 1965, Page 38.
২। Swami Vivekananda—'The science and philosophy of Religion.' Page 1.
৩। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৩২।
৪। ঐ — ঐ
৫। Maheswar Neog—Sankardev and His Times, Page 80. (ভাবানুবাদ লেখকের)

৬। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ৬৯ ;
(ভাবানুবাদ লেখকের)

৭। রাজশেখর বসু—শ্রীমদ্‌ভাগবদ গীতা, ভূমিকা।

৮। হীরেণ গোহাঞি—কীর্তন পুথির রস বিচার, পৃঃ ২৬।

৯। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃং ১২৮।

১০। হীরেণ গোহাঞি—শ্রীমন্ত শংকর আৰু অসমর ইতিহাস, বাস্তবর স্বপ্ন, পৃঃ ৯। (অনুবাদ লেখকের)

১১। S. Chatterjee—The place of Assam in the History and Civilisation of India. Guwahati University, 1970. Page 22।

১২। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৫৪।

১৩। ঐ —শ্রীমন্তশংকরদেব আৰু তেওঁর যুগর বৈষ্ণবাচার্য্য সকল, পৃঃ ৩৮।

১৪। মহেশ্বর নেওগ—শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ৮৫।

১৫। ঐ — ঐ পৃঃ ৮৬-৮৭।

১৬। শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৪৮।

১৭। শ্রীপূবারাম মহন্ত—বরদোবা গুরুচরিত, পৃঃ ১২৫-২৬।

১৮। বাণীকান্ত কাকতি—(সংগৃহীত)—কথা-গুরুচরিত, পৃঃ ১৬৩-৬৫।

১৯। Bhabaprasad Chaliha—Sankardeva : The Master Builder. The Assam Tribune, dated September 27, 1990.

২০। Maheswer Neog—Sankardev and his Times. Page 327-328.

২১। দ্বিজ পূর্ণানন্দদেব—শ্রীশ্রীগোপাল আতার রচিত, পৃঃ ৬১৪-১৭।

২২। ডঃ শিবনাথ বর্মন—শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

২৩। ঐ — ঐ পৃঃ ১৩৮।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ উপসংহাৰ ॥

১। শিবনাথ বৰ্মন—শ্ৰীমন্তশংকৰদেৱ কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৮০।

২। ঐ — ঐ পৃঃ ১৮১।

৩। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰওৱালা—জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰচনাবলী, পৃঃ ৪৪৯-৫০।

৪। Bhabaprasad Chaliha—Sankardeva the Master Builder. The Assam Tribune dated, 27th September, 1990.

৫। শিবনাথ বৰ্মন—শ্ৰীমন্তশংকৰদেৱ, কৃতি আৰু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৮৬।

———

পরিশিষ্ট (খ)

শ্রীমন্তশংকরদেব—জীবন ও যুগপঞ্জী

(১৪৪৯—১৫৬৮)

জন্ম ১৪৪৯ খৃঃ—মধ্য-অসমের বর্তমান নগাও জেলার বরদোবার নিকট আলিপুখুরী গ্রামে, কার্ত্তিক সংক্রান্তি, বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথির মধ্য-রাত্রি। জন্ম তারিখ, সন, তিথি ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন চরিতকারদের (রামচরণ ঠাকুর) মতে আশ্বিনের ৬ তাং শুক্রবার শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীশংকরের জন্ম হয়।

পিতা কুসুম্বর ভূঞা। পিতামহ সূর্য্যবর, প্রপিতামহ রাজধর। রাজধরের চার পুত্র—সূর্য্যবর, জয়ন্ত, হলায়ুধ এবং মাধব। চারভাই রামচোধুরীর চার কন্যা—খের সূতী, গুটিমালা, সুভদ্রা ও সুভগাকে বিবাহ করেন। সূর্য্যবর ও খেরসূতীর পুত্র কুসুম্বর।

মাতা অনিরুদ্ধ ভূঞার রূপবতী কন্যা সত্যসন্ধ্যা। সত্য-সন্ধ্যার মাতা সরস্বতী। বহুদিন সত্য সন্ধ্যার গর্ভে সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় কুসুম্বর পুণরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীপতি ভূঞার কন্যা অনুধৃতি।

কথিত আছে পুত্র লাভের আশায় শিঙ্গরি নামক স্থানের গোপেশ্বর শংকর মন্দিরে পূজা দিয়ে বরলাভ করার পর জন্ম হওয়ায় নবজাতকের নাম রাখা হয় শংকর।

১৪৫৪ খৃঃ—দ্বিতীয়া পত্নী অনুধৃতির গর্ভে শ্রীশংকরের বৈমাত্রেয় ভাই বনগঞা গিরির জন্ম হয়।

১৪৫৬ খৃঃ—শ্রীশংকরের পিতৃ বিয়োগ। কথিত আছে সত্যসন্ধ্যা স্বামীর সাথে সতী হয়েছিলেন। ভিন্নমতে শংকরের জন্মের কয়েক মাস পর সত্যসন্ধ্যার মৃত্যু হয়।

১৪৬১ খৃঃ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলির টোলে বিদ্যারম্ভ। কঠোর অধ্যবসায় সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, যোগাভ্যাস। অল্পকাল

মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয়। পাঠশালায় অন্যতম মেধাবী ছাত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ। ছাত্রাবস্থায় ক-কলা শিক্ষার পরেই "করতল কমল কমল দল নয়ন" ইত্যাদি আ-কার উ-কার বিহীন কবিতা রচনা করে সহপাঠি ও শিক্ষা গুরুর প্রশংসা অর্জন। পাঠশালার কয়েকজন সহপাঠী রামরায়, শ্রীকণ্ঠ ভূষণ, রাম সরস্বতী প্রমুখ। পরবর্তীকালে শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলি সহ এরা সবাই শ্রীশংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৪৬৬-৬৯ খৃঃ—পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত। গৃহে প্রত্যাবর্তন। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান রচনা। শিরোমণি ভূঞা পদ গ্রহণ। কম বয়সে গুরুদায়িত্ব বহন ও ডেকাগিরি উপাধি লাভ। বরদোবায় কীর্তন ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে খনন কাজ চলাকালীন বিষ্ণু মূর্তি প্রাপ্তি। কীর্তন ঘরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। কীর্তন ঘোষার গীত রচনা আরম্ভ। ধর্ম চর্চা ও ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ। বিষয় কর্মে অনীহা, কাকা জয়ন্ত ও মাধব ভূঞার হস্তে শিরোমণি ভূঞা পদ অর্পণ।

১৪৭০ খৃঃ—প্রথম বিবাহ। পত্নী হরিহর গিরির কন্যা সূর্য্যবতী। সে সময় শংকরের বয়স ২১ ও সূর্য্যবতীর ১৪।

১৪৭৩ খৃঃ—সংসার ধর্ম পালন। প্রথম কন্যা মনুর জন্ম। মনুর জন্মের ৯ মাস পর সূর্য্যবতীর অকাল মৃত্যু।

১৪৭৩-৮০ খৃঃ—কন্যার লালন পালন। মাত্র ৯ বৎসর (ভিন্নমতে ৭ বৎসর) বয়সে রামচন্দ্র কায়স্থর পুত্র হরির সঙ্গে কন্যা মনুর বিবাহ।

১৪৮০ খৃঃ—নীলাম্বরের জামাতা রাজ সিংহাসনে আরোহন।

১৪৮১ খৃঃ—জামাতা হরির উপর বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ। তীর্থ যাত্রার আয়োজন। রামরাম, পরমানন্দ, সর্বজয়, গোবিন্দ, মুকুন্দ, দামোদর আতা এবং শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলি সহ মোট সতের জনসঙ্গী সহ তীর্থ যাত্রা। শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম, সীতাকুণ্ড, বরাহক্ষেত্র, পুস্করতীর্থ, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম, প্রভৃতি তীর্থ দর্শন। প্রথম বরগীত—"মন মেরী রাম চরণহি লাগু" রচনা।

১৪৮৮ খৃঃ—আহোমরাজ চুচেণফার মৃত্যু। চুহেণফার আহোম রাজসিংহাসনে আরোহণ।

বরদোবার দক্ষিণে নলঞ্চা বা নলচা গ্রামে শ্রীমন্তশংকরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিষ্য শ্রীদামোদর দেবের জন্ম। পিতা সদানন্দ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। মায়ের মাম সুশীলা। দামোদরদেব নব বৈষ্ণব ধর্মের দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের গুরু ও একশরণ ধর্মের প্রধানতম প্রচারক।

১৪৮৯ খৃঃ—শ্রীমন্তশংকরের যোগ্যতম উত্তরসূরী ও প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমাধবদেবের জন্ম। শ্রীমাধবদেবের আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের রঙ্পুর জেলার ধর্ণা (বর্তমান নাম ধলেশ্বরী) নদীতীরস্থ বাণ্ডুকা গ্রাম। পিতা গোবিন্দ গিরি। গোবিন্দ গিরির দুই পত্নী, অনুচিতা ও মনোরমা। প্রথম পুত্র দামোদরের জন্মেয় পর অনুচিতার মৃত্যু হয়। দামোদর বড় হলে তাঁর হাতে বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করে গোবিন্দ গিরি বাণিজ্যে বার হয়ে বরদোবায় এসে উপস্থিত হন। কুসুম্বর ভূঞা নিজ বংশের কন্যা মনোরমার সঙ্গে গোবিন্দ গিরির বিবাহ দেন। নারায়ণপুরের হরিশিঙ্া বরার ঘরে মনোরমার গর্ভে মাধবদেবের জন্ম হয়।

১৪৯৩ খৃঃ—সুদীর্ঘ ১২ বৎসর (১৪৮১-৯৩) তীর্থ ভ্রমনান্তে সঙ্গীগণ সহ স্বগৃহ আলিপুখুরী প্রত্যাবর্তন।

উত্তর লক্ষীমপুরেব নারায়ণপুর গ্রামে শ্রীহরিদেবের জন্ম। ইনি একশরণ নামধর্মের হরিদেবী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। হরিদেবের পিতার নাম অজনাভ, মা-এর নাম পারিজাতী।

যুবরাজ চুপিমফার আহোম রাজ সিংহাসনে আরোহণ।

১৪৯৫ খৃঃ—উত্তর গুয়াহাটীর মালো গ্রামে শ্রীশংকরের প্রিয় শিষ্য এবং শ্রীমাধবদেবের বন্ধু নারায়ণদাস ঠাকুর আতার জন্ম। পিতার নাম হরিপ্রিয়া।

১৪৯৭ খৃঃ—চুহুং মুং (দিহি ঙীয়া রাজা), হিন্দুনাম স্বর্গ নারায়ণ আহোম রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। হিন্দুনাম গ্রহণ করা ইনিই প্রথম আহোম রাজা।

১৪৯৮ খৃঃ—গৌড় বাদশাহ হোসেন শাহের দ্বারা কামাতা রাজ্য ধ্বংস। নীলাম্বর কামাতা রাজ্যের শেষ নৃপতি।

১৫০৩-১০ খৃঃ—বরদোবায় ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ। একাত্মভাবে ধর্ম চর্চা, সাহিত্য রচনা। প্রথম রচনা রুক্মিণীহরণ কাব্য। পরে ভক্তি-প্রদীপ রচনা। প্রথম নাটক চিহ্ন যাত্রা রচনা ও অভিনয়। অভিনয় কালে দিব্য অনুভূতি লাভ। শিক্ষা গুরু মহেন্দ্র কন্দলি সতীর্থ রামরাম, চতুর্ভূজ, বিদ্যারত্ন প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সহ সর্বজয়, বলরাম, জয়রাম প্রভৃতি ভূঞাদের শ্রীশংকরের নিকট ভক্তিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ।

অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, চতুর্বিংশতি অবতার ইত্যাদি কীর্তনঘোষার অধ্যায়গুলো রচনা।

ভাগবতের ষষ্ঠ ও অষ্টম স্কন্ধের অনুবাদ।

১৫১৩ খৃঃ—চুতিয়া রাজ ধীরনায়ণের আহোম রাজ্য আক্রমণ ও পরাজয় বরণ।

১৫১৫ খৃঃ—বিশ্বসিংহ কর্তৃক কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

১৫১৭ খৃঃ—কাছারী আক্রমণ। শ্রীশংকরের বরদোবা ত্যাগ। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে আহোম রাজ্যে বসতি স্থাপন।

১৫১৮ খৃঃ—গাংমৌ নামক স্থানে ৭ বৎসর বাস ও ধর্মপ্রচার। প্রথম পুত্র রামানন্দের জন্ম।

১৫২৪-৪৩ খৃঃ—মাজুলী দ্বীপে ধুয়াহাটা রেলগুরিতে পাকাপাকিভাবে বসবাস। শংকর-মাধব সাক্ষাৎ। শ্রীমাধবদেবের একশরণ ধর্মে দীক্ষা। ভক্তি ধর্ম প্রচার। শ্রীশংকরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কমললোচন ও হরিচরণের জন্ম।

শাস্ত্রজ্ঞ কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণদের চক্রান্ত। রাজরোষ, মাধবদেবের কারাবাস। জামাতা হরির শিরচ্ছেদ।

পত্নীপ্রসাদ নাটক ও বরগীত রচনা। কীর্তন ঘোষার পাষণ্ড মর্দন, নামাপরাধ, শিশুলীলা, কংস বধ, গোপী উদ্ধার সংবাদ ইত্যাদি অধ্যায়গুলো রচনা।

দিহিভীয়া রাজার চুতীয়া রাজ্য দখল। আহোম-কাছারী যুদ্ধে কাছারীদের পরাজয়। মুসলমান আক্রমণ।

কোচ রাজ নরনারায়ণের সিংহাসন লাভ।

১৫৪৩-৪৭ খৃঃ—শ্রীশংকর-মাধবের আহোম রাজ্য ত্যাগ। ক্যমরূপ রাজ্যে গমণ। পালেংদি নামক স্থানে এক বৎসর বাস। ঠাকুরদাস আতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঠাকুরদাস সহ গোবিন্দ, গরমিল প্রমূখ শিষ্যদের নাম ধর্মে শরণ। কুমারকুচি বাস এক বৎসর। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু।

১৫৪৭ খৃঃ—রাজা নরনারায়ণ ভ্রাতা কোচ সেনাপতি চিলারায়ের আহোম রাজ্য আক্রমণ ও উত্তরে নারায়ণপুর পর্য্যন্ত আহোম রাজ্য অধিকার।

১৫৪৭-৫২ খৃঃ—শ্রীশংকর-মাধবের পাট বাউসী আগমন।

শ্রীমাধবদেব, রামরাম, নারায়ণ, গোবিন্দ প্রমুখ ১২০ জন ভক্তশিষ্য সহ দ্বিতীয়বার তীর্থ যাত্রা।

শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ পুরী ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করে ৬ মাস পর পাট বাউসী প্রত্যাবর্তন।

দামোদরদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দামোদরের একশণ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। শ্রীরাম, উদার গোবিন্দ, মুরারী কোঁচ, চান্দশাহ প্রমুখের দীক্ষা গ্রহণ। অনন্ত কন্দলির ভক্তিধর্মে শরণ।

১৫৫২-৫৩ খৃঃ—জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দর বিবাহ। দ্বিতীয় পুত্র কমললোচনের অকাল মৃত্যু। কোচ সেনাপতি চিলারায়ের সঙ্গে জ্ঞাতি-ভাই-কন্যা কমলপ্রিয়ার বিবাহ। চিলারায়ের ভক্তি-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ।

আহাম-কোচ যুদ্ধ। দিখৌ নদী পর্য্যন্ত কোচ রাজ্য বিস্তার। কালাপাহাড়ের কামরূপ আক্রমণ, ফলে শাক্তপীঠ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস।

১৫৫৪-৬৮ খৃঃ—কর্মকাণ্ডী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শে রাজরোষ। শ্রীশংকরকে বন্দী করে রাজসভায় আনয়নের আদেশ। চিলারায়ের বিচক্ষণতায় রক্ষা।

নরনারায়ণের রাজসভায়শ্রীশংকরের সঙ্গে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের তর্কযুদ্ধে পরাজয়। রাজানুগ্রহ—বরপেটার গোমস্তা পদ লাভ, পরে সেই পদের দায়িত্ব রামরায়ের হাতে অর্পণ।

বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসী রচিত 'ভক্তি রত্নাবলী' প্রাপ্তি, মাধবদেবকে

অনুবাদের নির্দেশ। শ্রীমাধবদেবের উপর ধর্মপ্রচারের ভার অর্পণ।

ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম, নবম, দশম ও দ্বাদশ স্কন্ধের অসমীয়া রূপান্তর সমাপ্ত।

অনাদি-পাতন, নিমি-নরসিদ্ধ সংবাদ রচনা। ভক্তি রত্নাকর সংকলন, কীর্তণ ঘোষা সমাপ্ত, বরগীত রচনা। 'রুক্মিণী হরণ', 'পারিজাত হরণ', 'কালিয়দমন' এবং শেষ রচনা 'রামবিজয়' নাটক রচনা।

১৫৬৮ খৃঃ—কোচ রাজ নরনারায়ণের ভক্তি-ধর্মে শরণ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ। শ্রীশংকরের দীক্ষাদানে অসম্মতি, কারণ রাজরাজাদের ভক্তি সাধারণের ন্যায় ঐকান্তিক নয়। বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব রাজ্যশাসনের প্রতিবন্ধক। নরনারায়ণের পীড়াপীড়ি সত্বেও অনতিকাল পূর্বে শাক্তপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের পুণনির্মাতা মহারাজ নরনারায়ণকে দীক্ষাদানে অসম্মতি। মৌখিক আশ্বাস।

২১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির বেলা দ্বি-প্রহরে ইহলীলা সম্বরণ। তোরসা নদীতীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন।

(চরিতকারদের রচনা ও কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, ডঃ মহেশ্বর নেওগ, ডঃ শিবাথ বর্মন প্রমুখের রচনা থেকে সংকলিত। লেখকদের মতে অনেক সন তারিখ আনুমানিক।)

পরিশিষ্ট (গ)

শ্রীমন্তশংকর রচনাবলী, জীবনী ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ

শ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলী ঃ

১। কীর্তন, মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত। দত্তবরুয়া এণ্ড-কোম্পানী, গুয়াহাটী, ১৯৭২।

২। দশম (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ), শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ডিব্রুগড়।

৩। ভক্তি প্রদীপ, হরি নারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী, ১৯৭২।

৪। নিমি-নরসিদ্ধ সংবাদ, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী, ১৯৭৪।

৫। অনাদি পাতন, গৌরীচরণ বরকটকী, যোরহাট।

৬। গুণমালা, শ্রীধর্মদেব অধিকার সম্পাদিত, গুয়াহাটী, ১৯৬৮।

৭। কালীয়দমন নাট, রাজমোহন নাথ সম্পাদিত, যোরহাট, ১৯৪৫।

৮। রুক্মিণীহরণ কাব্য, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, গুয়াহাটী, ১৯৭২।

৯। ভক্তি রত্নাকর, রামচরণ ঠাকুর অনুদিত, মোহন চন্দ্র মহন্ত সম্পাদিত, যোরহাট, ১৯৪৮।

১০। ভক্তি রত্নাকর, গোপালদ্বিজ অনুদিত, নবীনচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৮১।

১১। বরগীত, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী. ১৯৭৫।

১২। অংকীয়া নাট, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া সম্পাদিত, গুয়াহাটী, ১৯৫৪।

(শ্রীমন্ত শংকরদেবের রচনাবলীর সম্পূর্ণ-তালিকা এই গ্রন্থের ৩৬-৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

চরিতাবলী বা চরিত পুথি ঃ

১। শংকরদেব-মাধবদেব চরিত—দৈত্যারি ঠাকুর, রাজমোহন নাথ সম্পাদিত, ১৯৭৮।

১। শ্রীশংকরদেব—ভূষণ দ্বিজ, দুর্গাবর বরকটকী সম্পাদিত, যোরহাট, ১৯২৫।

৩। গুরুচরিত—রামানন্দ দ্বিজ, মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত, ১৯৫৭।

৪। গুরুচরিত—রামচরণ ঠাকুর, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী।

৫। কথা-গুরুচরিত—চক্রপাণি, উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু সম্পাদিত, গুয়াহাটী, ১৯৬৪।

৬। বরদোবা গুরুচরিত—মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত, গুয়াহাটী, ১৯৮০।

৭। গুরুলীলা—রামরায় দ্বিজ, শরৎচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, বরপেটা, ১৯৩৭।

৮। ঠাকুর চরিত—বিদ্যানন্দ ওজা ও হরিনারায়ণ দ্বিজ, কেশবানন্দ দেব গোস্বামী সম্পাদিত, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭।

শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবনী :

ইংরাজী—

1. Sankardeva—Banikanta Kakati, Madras, 1921.
2. Sankardeva : Vaisnavite Saint of Assam—Birinchi Kr. Barua, Guwahati, 1962.
3. Jagat-Gurn Sankardava—Dimbeswar Neog, Nowgong, 1963.
4. Sankardev and His Times—Maheswar Neog, Guwahati, 1965.
5. Sankardeva—Maheswar Neog, National Book Trust, 1967.

অসমীয়া—

১। শ্রীশ্রীশংকরদেব—লক্ষীনাথ বেজবরুৱা, বেজবরুৱা গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, গুয়াহাটী, ১৯৬৮।

২। মহাপুরুষ শংকরদেব আরু মাধবদেব—লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী, গুয়াহাটী।

৩। শ্রীশ্রীশংকরদেব—মহেশ্বর নেওগ, গুয়াহাটী, ১৯৬৫।

৪। যুগনায়ক শংকরদেব—ডিম্বেশ্বর নেওগ, গুয়াহাটী।

৫। মহাপুরুষ শংকরদেব,—বাপচন্দ্র মহন্ত, যোরহাট, ১৯৬৪।

৬। শ্রীমন্তশংকরদেব কৃতি ও কৃতিত্ব—শিবনাথ বর্মন, গুয়াহাটী, ১৯৮৬।

বাংলা—

১। শংকরদেব—শ্রীউমেশচন্দ্র দেব। (সম্প্রতি শ্রীনগেন শইকীয়া সম্পাদিত—শ্রীভূমি প্রকাশন হইতে প্রকাশিত।

২। মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদেব—রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী, Lawyers, Book Stall, Guwahati, 1988.

প্ৰাসঙ্গিক গ্ৰন্থ সমূহ ঃ

ইংৰেজী—

1. The Religion of Love and Devotion—L. N. Barua, Assam Sahitya Sabha.
2. A Cultural History of Assam—B. K. Barua, Guwahati, 1969.
3. The place of Assam in the History—S. K. Chatterjee, and Civilization of India, Guwahati University, 1970.
4. The History of Civilisation of Assam—P. C. Chowdhury, Guwahati, 1960.
5. A History of Assam, Calcutta, 1967—E. Gait.
6. Introducing Assam Vaisnavism—S. C. Goswami Guwahati, 1946.
7. Studies in the Vaisnava Literature and Culture of Assam. Kaliram Medhi Assam Sahitya Sabha. 1978,
8. The Neo Vaisnavite Movement and the Satra Institution of Assam.—S. N. Sarma, Guwahati University, 1966.
9. Kirata Jana Kriti—S. K. Chatterjee, Asiatic Society, Calcutta, 1974
10. Lokayata—D. P. Chattopadhaya. People's Publishing House, 1973.
11. The Origin and Development of Vaisnavism– S. Jaiswal, New Delhi, 1967.
12. Vaisnavite Myths and Legends—B.K. Kakati. Guwahati, 1951.
13. The Cultural Heritage of India,—S. Radhakrishnan Ramkrishna Mission Institute of Calcutta, (4 Vols.), 1956.

14. The Religlon of India, Max Waber—Illinois, 1972.
15. The Science and Philosophy of Religion—Swami Vivekananda. Udbodhan office, Calcutta-3.

অসমীয়া—

১। কীৰ্তন পুথিৰ ৰস-বিচাৰ,—হীৰেণ গোহাঞি গুৱাহাটী, ১৯৮১।
২। অসমীয়া সাহিত্যের ৰূপৰেখা—মহেশ্বৰ নেওগ গুৱাহাটী, ১৯৬৪।
৩। অসম বুৰঞ্জী—গুণাভিৰাম বৰুয়া, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৭২।
৪। অসম বুৰঞ্জী—সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগ গুৱাহাটী, ১৯৬২।
৫। অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস—বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গুৱাহাটী, ১৯৮৩।
৬। শংকৰদেবৰ চিন্তাত প্ৰগতিশীলতা—সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, প্ৰস্তাব গোষ্ঠী ডিব্ৰুগড়, ১৯৮২।
৭। ভাৰতীয় চিন্তা, প্ৰথম খণ্ড—শিবনাথ বৰ্মন, গুৱাহাটী, ১৯৮৭।
৮। পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা—বাণীকান্ত কাকতি, গুৱাহাটী, ১৯৬৮।
৯। অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য—বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। অসম সাহিত্য সভা ১৯৭৭।
১০। শংকৰদেবৰ চৰিত্ৰ অধ্যয়ন, সমাজ আৰু সমালোচনা—(প্ৰবন্ধ), হীৰেণ গোহাঞি, গুৱাহাটী, ১৯৭১।
১১। শ্ৰীমন্তশংকৰ আৰু অসমৰ ইতিহাস, বাস্তবৰ স্বপ্ন—হীৰেন গোহাঞি। গুৱাহাটী, ১৯৭২।

বাংলা—

১। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা।
২। লোকায়ত দর্শন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯২৬।
৩। ভারতীয় দর্শন, আদিপর্ব—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা, ১৯৮০।
৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত, দেব সাহিত্য কুটির কলিকাতা-৯।

———